৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০২

টপিক:

বিশ্বের সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী চলকসমূহ: আধুনিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ, সার্বভৌমত্ব, অ-রাষ্ট্রীয় কর্ম, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্মসমূহের মধ্যে সম্পর্ক।

শক্তি ও নিরাপত্তা: জাতীয় শক্তি, শক্তিসাম্য, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ, ভূ-রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

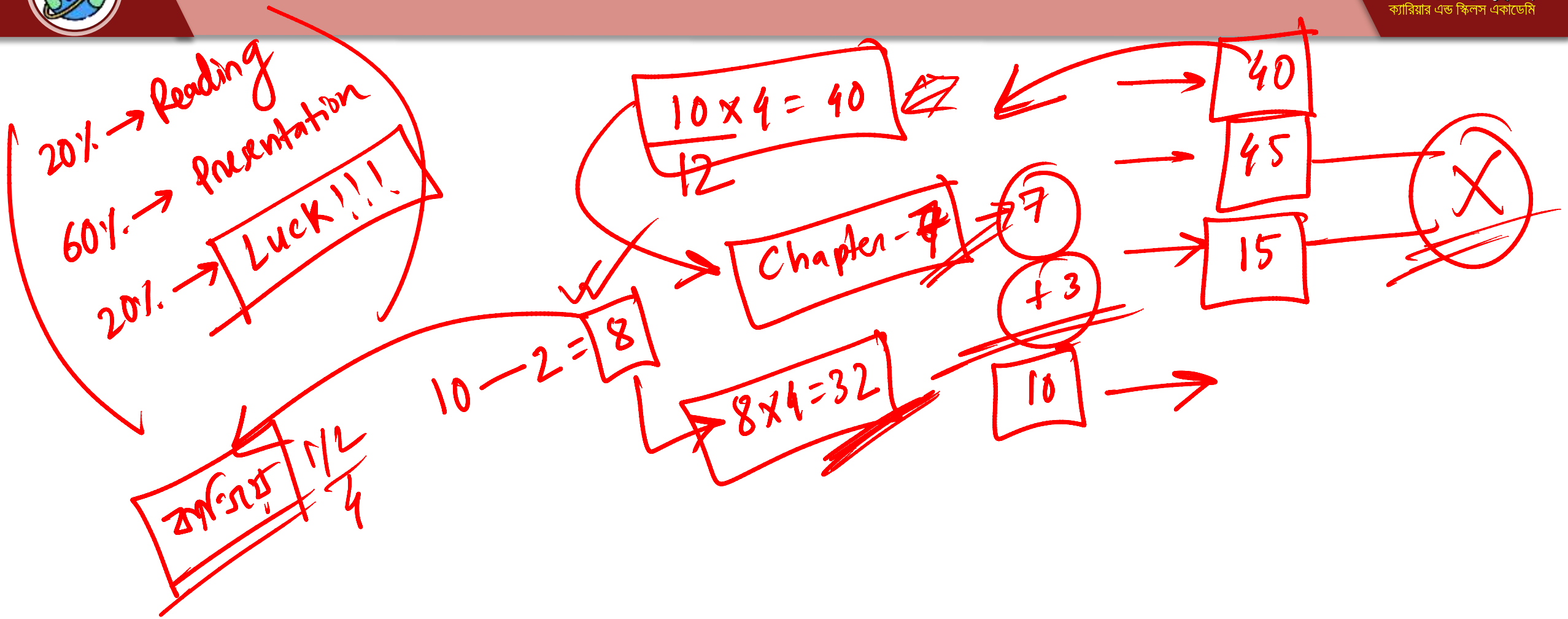

20% → Reading
60% → Presentation
20% → Luck!!!
10 × 4 = 40
12
Chapter-7
7
+3
10 − 2 = 8
8×4=32
10
40
45
15

Category

1) Definition →

2) Explanation →

3) Organization →

4) Unknown →

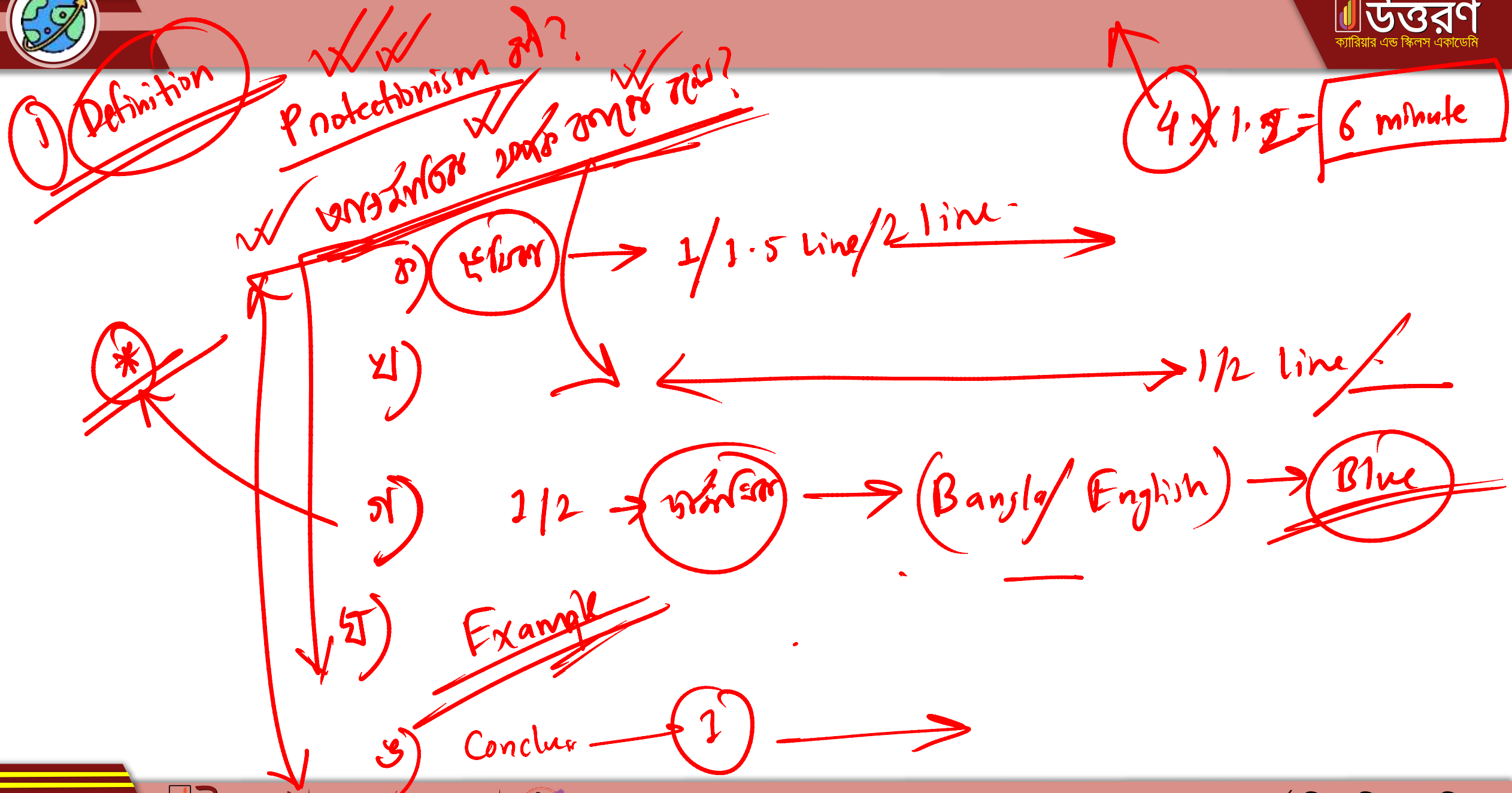

1) Definition

Protectionism কী?

4 x 1.5 = 6 minute

ক) ভূমিকা → 1/1.5 line/2 line

খ) ← → 1/2 line

গ) 1/2 → মূলবিষয় → (Bangla/English) → Blue

ঘ) Example

ঙ) Conclu → 1

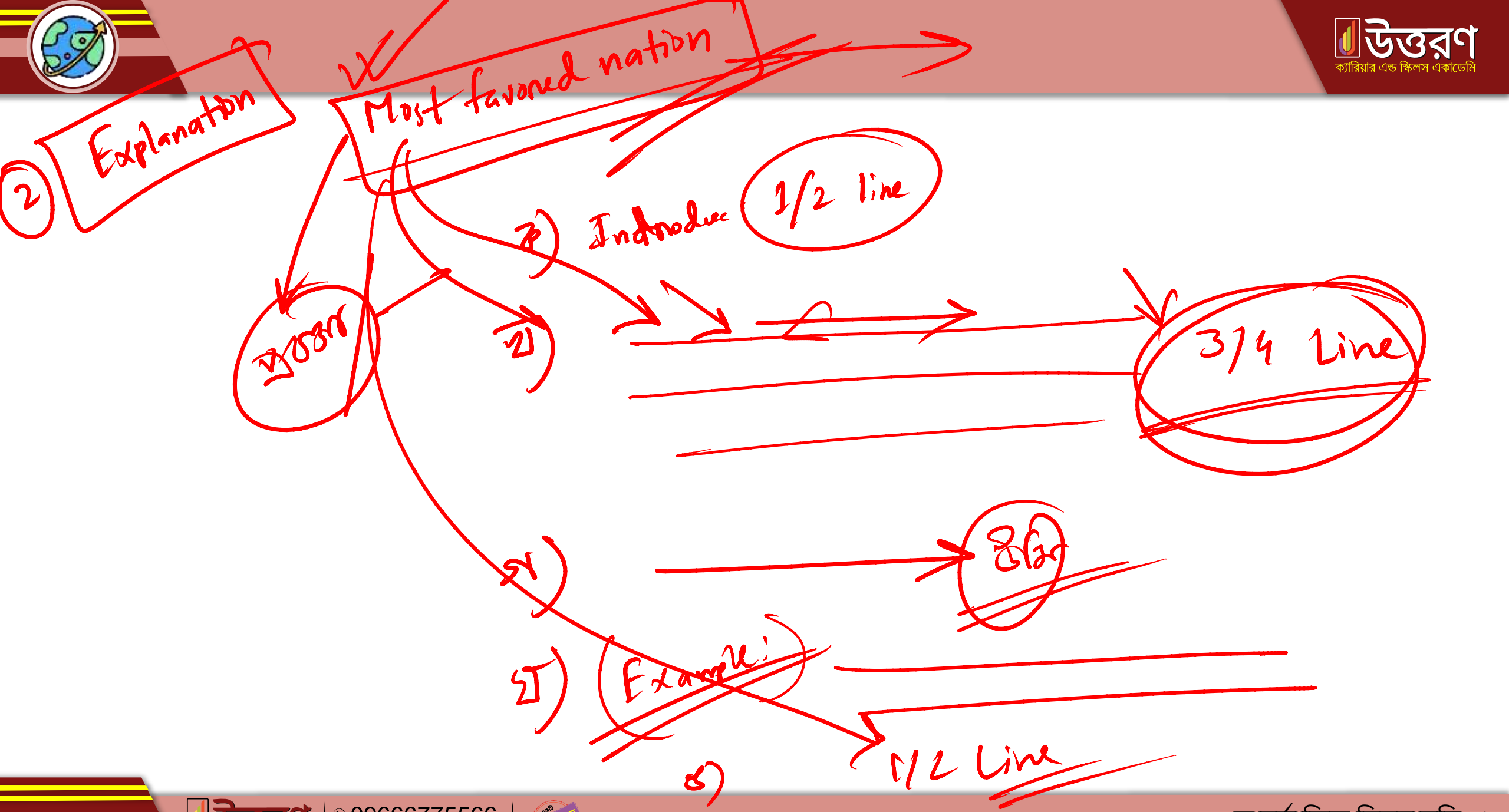

2) Explanation

Most favored nation

ক) Introduce — 1/2 line

খ) — 3/4 Line

গ)

ঘ) Example: — 1/2 Line

ঙ)

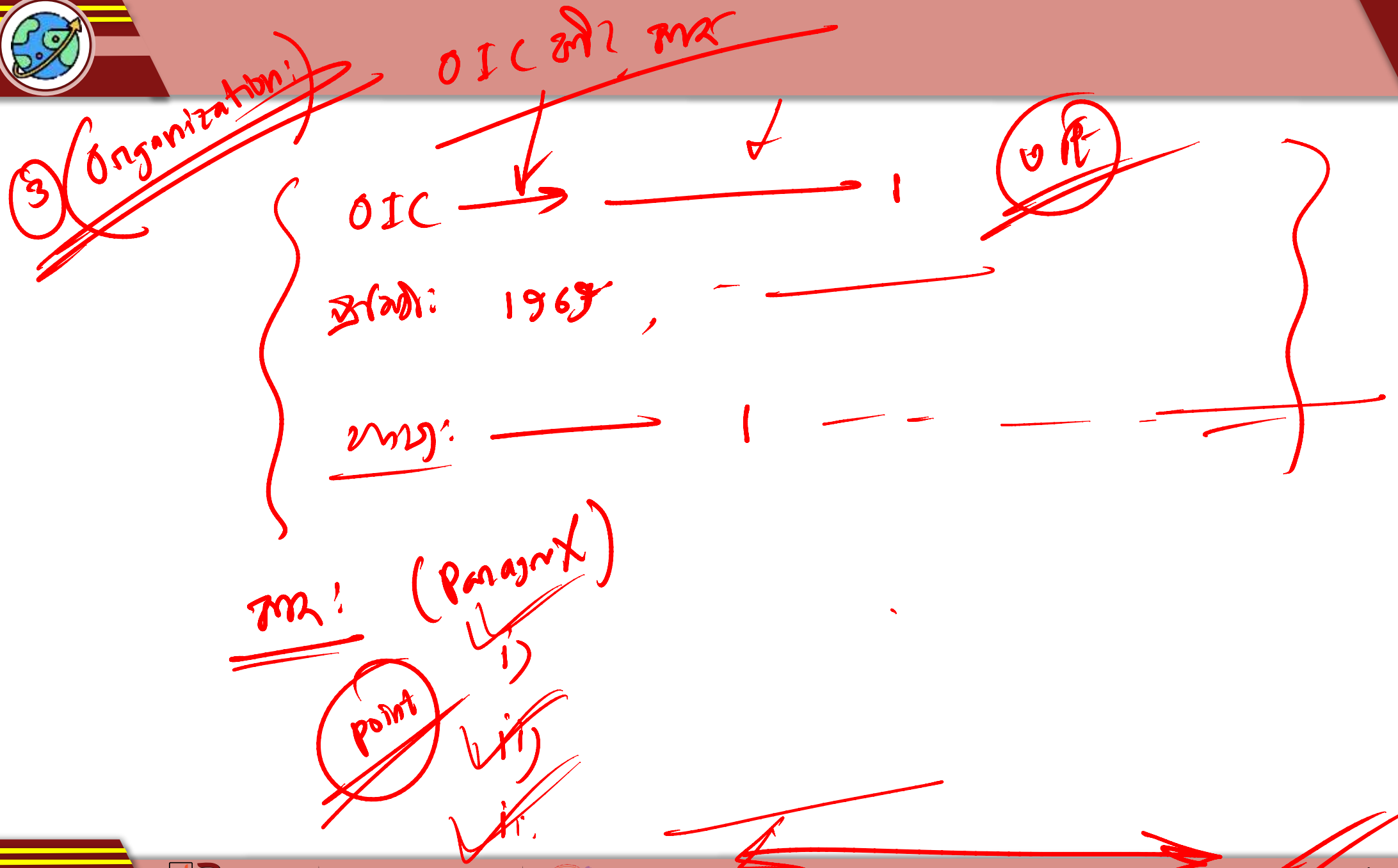

OIC এর নাম

③ (Organization):

OIC →

প্রতিষ্ঠা: 1969

সদস্য:

নাম: (Paragraph)

point

i)

ii)

iii)

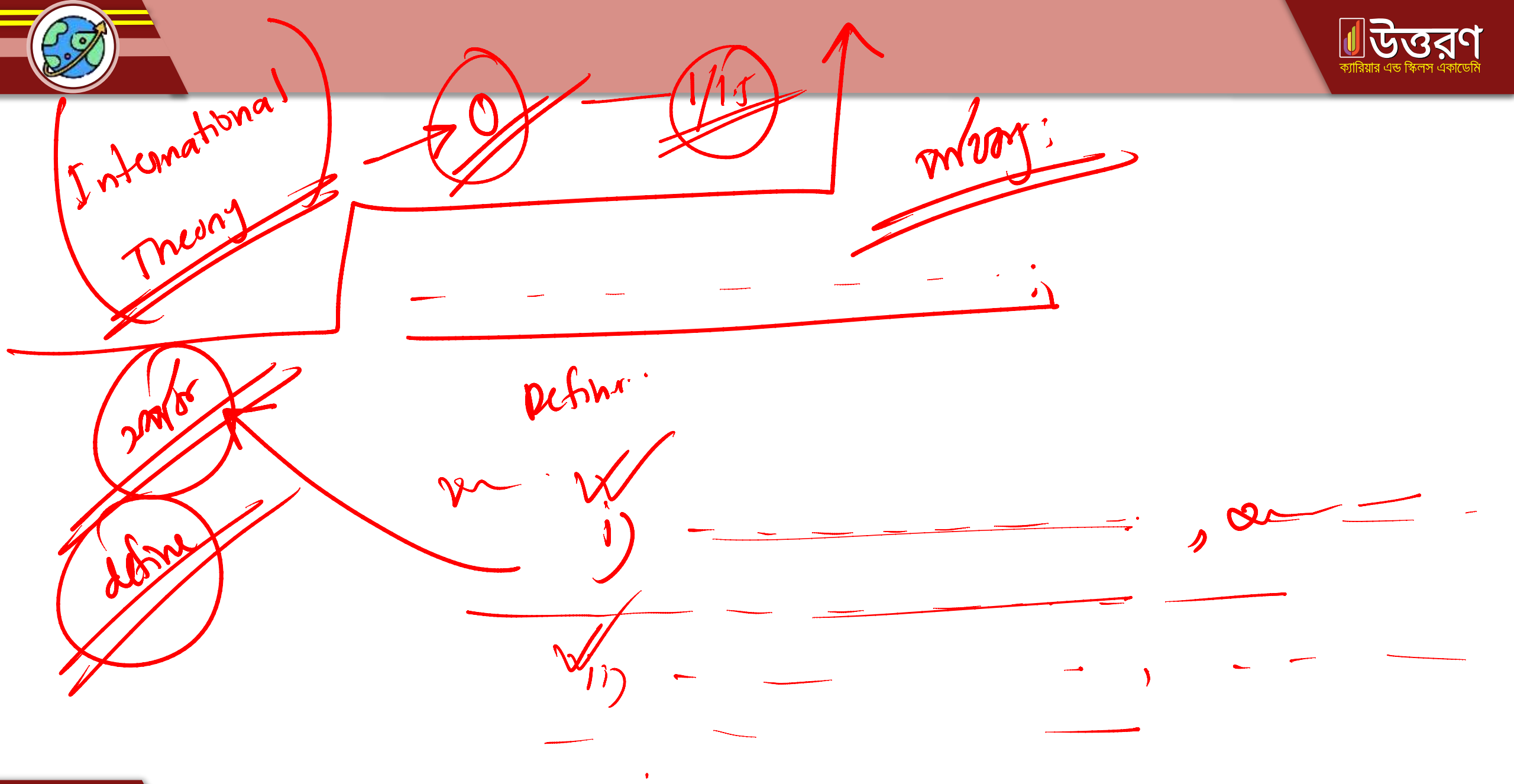
International
Theory

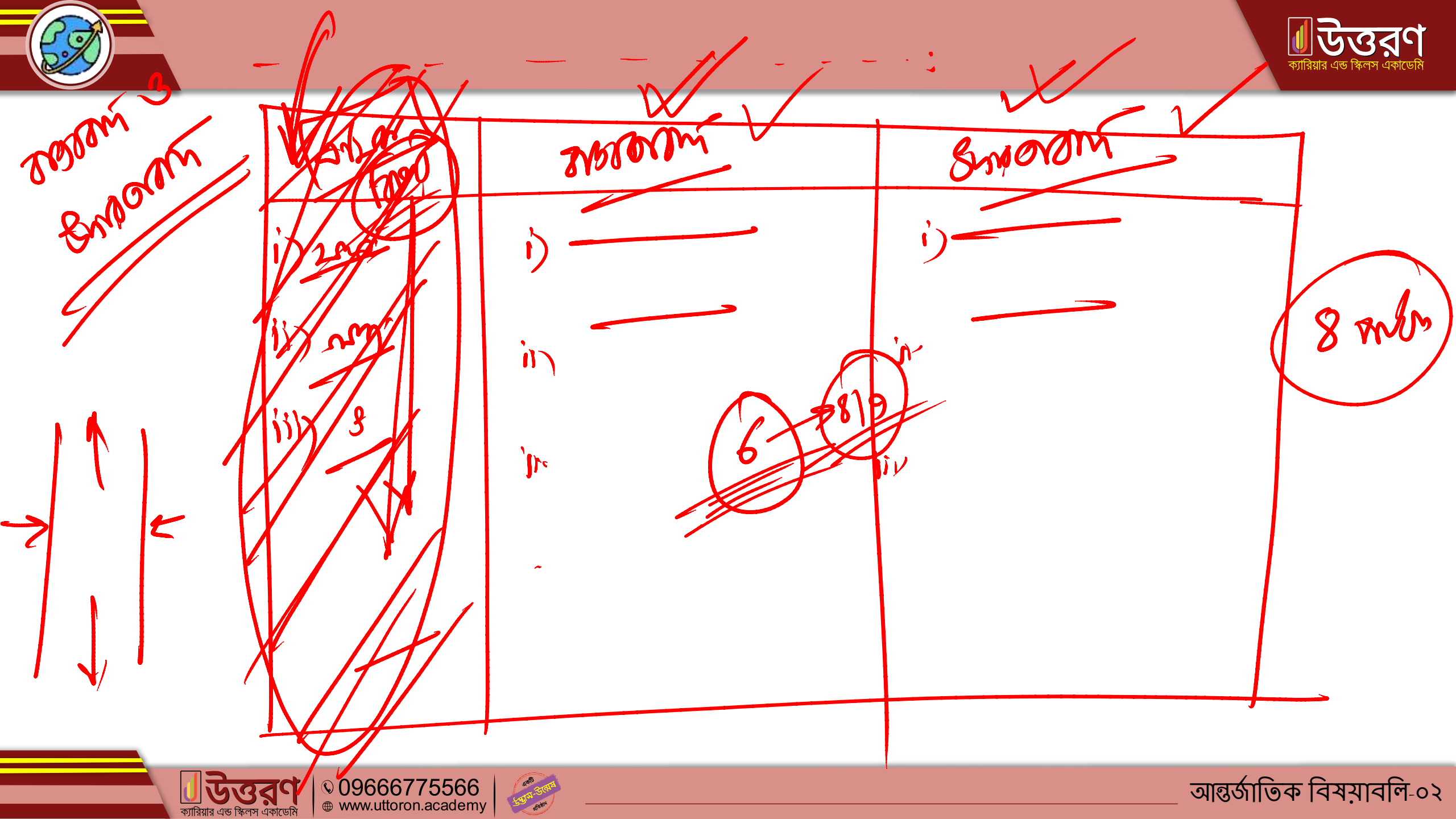

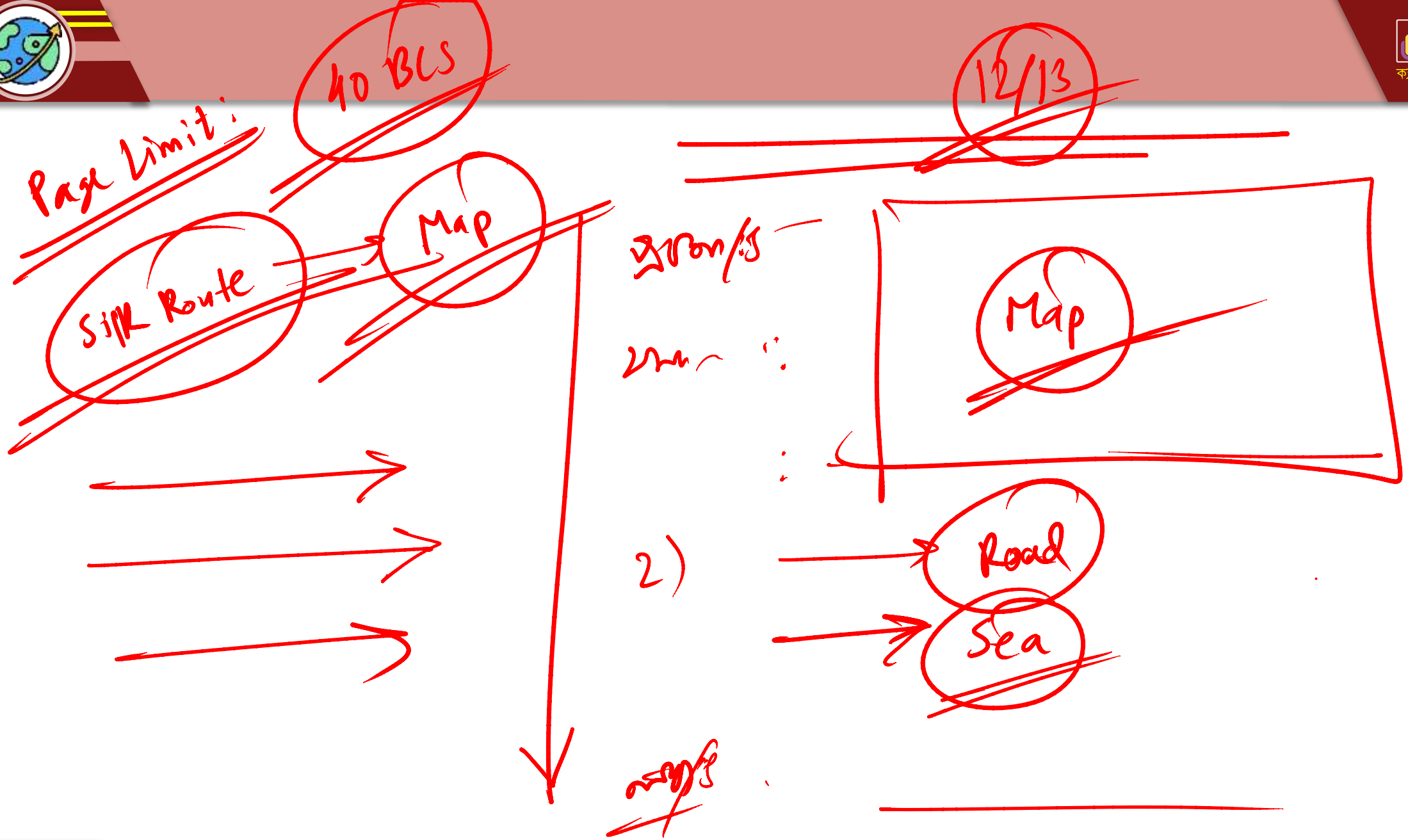
40 BCS
12/13
Page Limit:
Silk Route
Map
Map
2)
Road
Sea

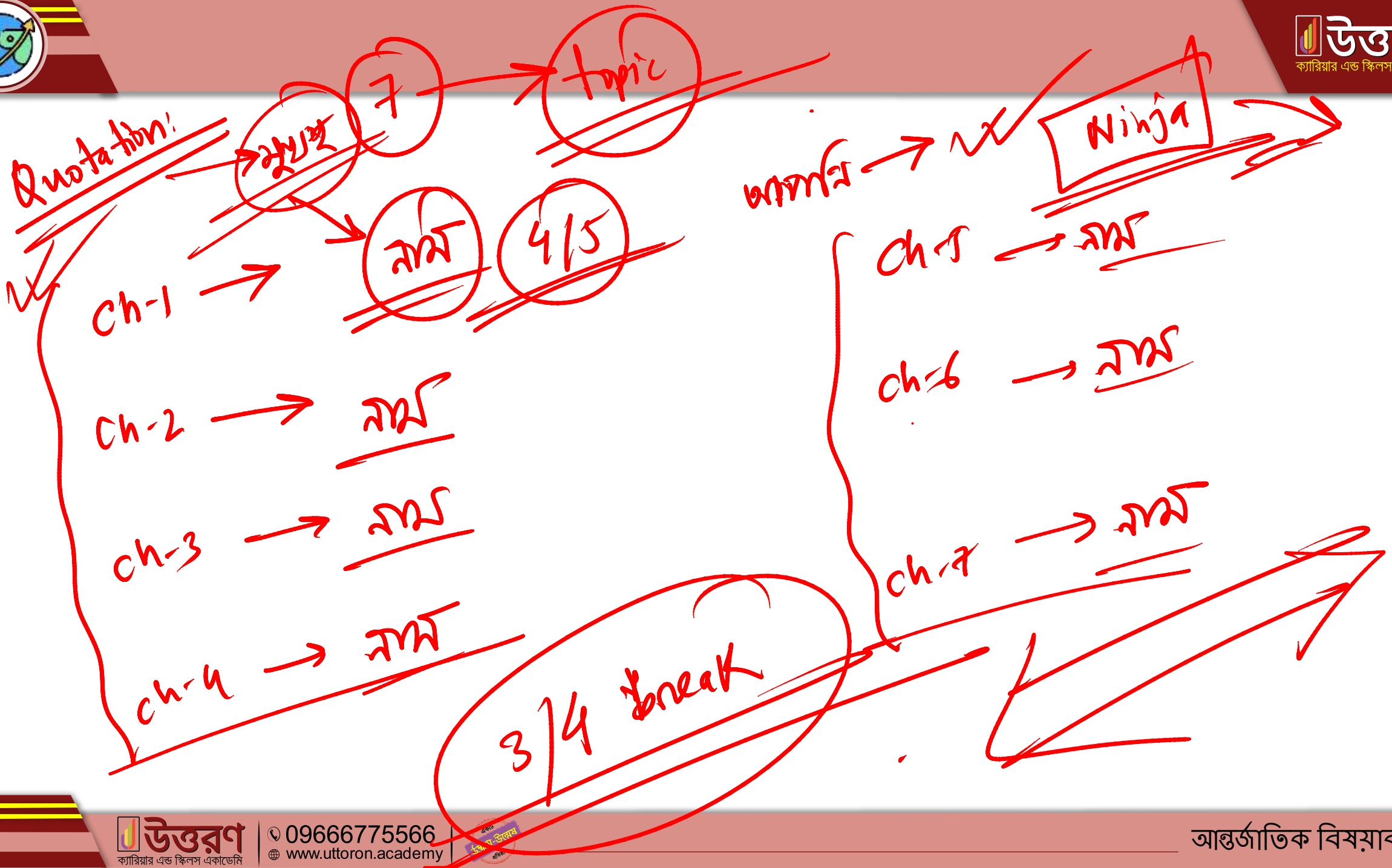

Quotation: → মুখস্থ → 7 → topic

মুখস্থ → নাম 4/5

Ch-1 →

Ch-2 → নাম

Ch-3 → নাম

Ch-4 → নাম

3/4 break

আপনি → Ninja

Ch-5 → নাম

Ch-6 → নাম

Ch-7 → নাম

রাষ্ট্র

নাগরিক জীবনের অন্যতম সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাষ্ট্র শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia এর মতে, 'A state is the highest political association.'

- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle) বলেন,
  "The state is a union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficing life". অর্থাৎ "রাষ্ট্র হচ্ছে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন।"
- উড্রো উইলসন এর মতে,
  "A state is a people organized for law within a definite territory" অর্থাৎ "রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সংগঠিত একটি জনসমাজ।"
- অধ্যাপক জে. এন গার্নার (J.N. Garner) রাষ্ট্রের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে,
  "রাষ্ট্র হচ্ছে বহুসংখ্যক বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ, যা কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি ঐ জনসমাজ স্বাভাবিকভাবে অনুগত।"

সুতরাং রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি সংঘ যার নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড আছে, যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টি আছে, যাদের একটি সরকার এবং সার্বভৌমত্ব আছে। এ সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা- নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালের মন্টিভিডিও কনভেনশনে রাষ্ট্র হতে হলে ৪টি শর্ত পূরণের কথা বলা হয়েছে। এই ৪টি শর্ত পরবর্তীতে রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়াও রাষ্ট্রের অন্যান্য কিছু উপাদান রয়েছে যা গৌণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রের উপাদান প্রধানত দুই প্রকার। যথা- মুখ্য উপাদান ও গৌণ উপাদান।

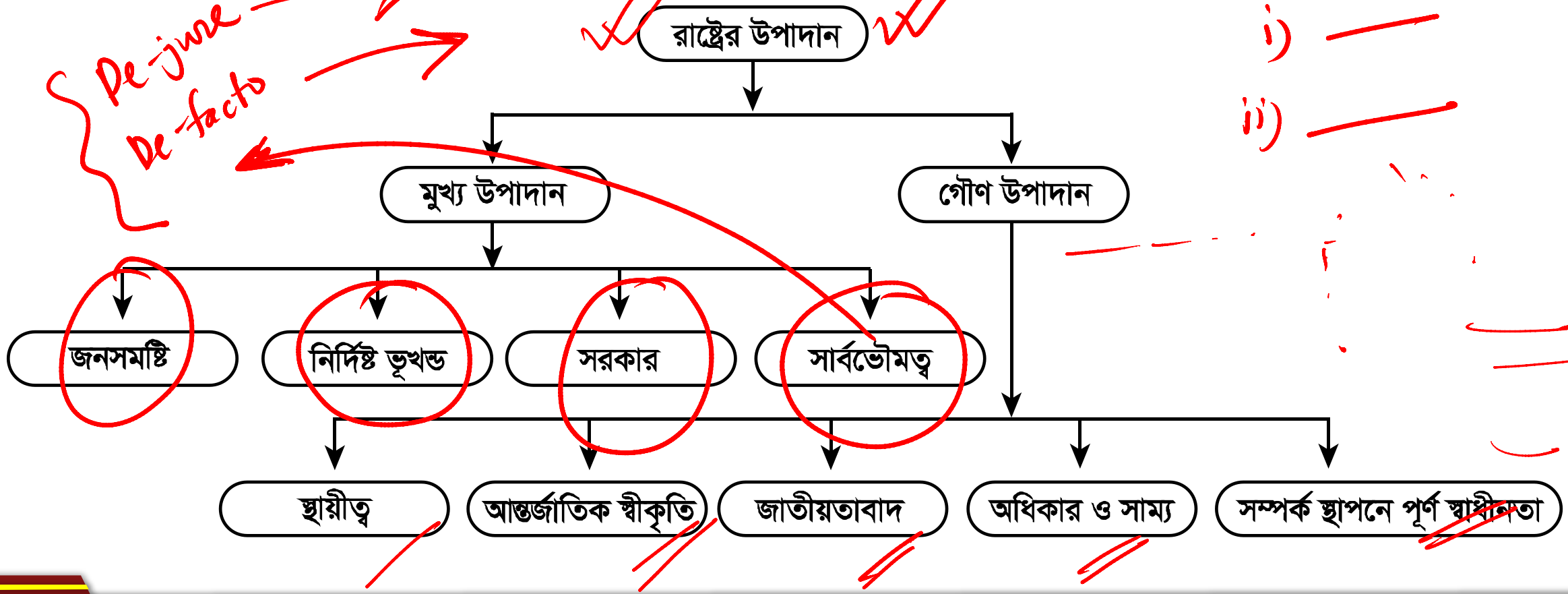

রাষ্ট্রের উপাদান

- **জনসমষ্টি:** রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান জনসমষ্টি। তবে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য কী পরিমাণ জনসমষ্টি প্রয়োজন, এর কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, একটি রাষ্ট্রের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়। এরিস্টটলের মতে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এত কম হবে না যাতে রাষ্ট্রীয় কাজে লোকবলের অভাব ঘটে। আবার এত বেশি হবে না যাতে রাষ্ট্র তাদের ভরণ পোষণ করতে অপারগ হয়।

- **নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড:** রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড আবশ্যক। ভূ-খণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে।

- **সরকার:** রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকার। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে । যথা- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকাজ সরকারই পরিচালনা করে থাকে।

- **সার্বভৌমত্ব:** সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এরিস্টটলের মতে, Sovereignty is the supreme power in the state. ১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia তে বলা হয়েছে, A state must be sovereign. সার্বভৌমত্বের দু'টি দিক রয়েছে, যথা- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার উপর কর্তৃত্ব করে। অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

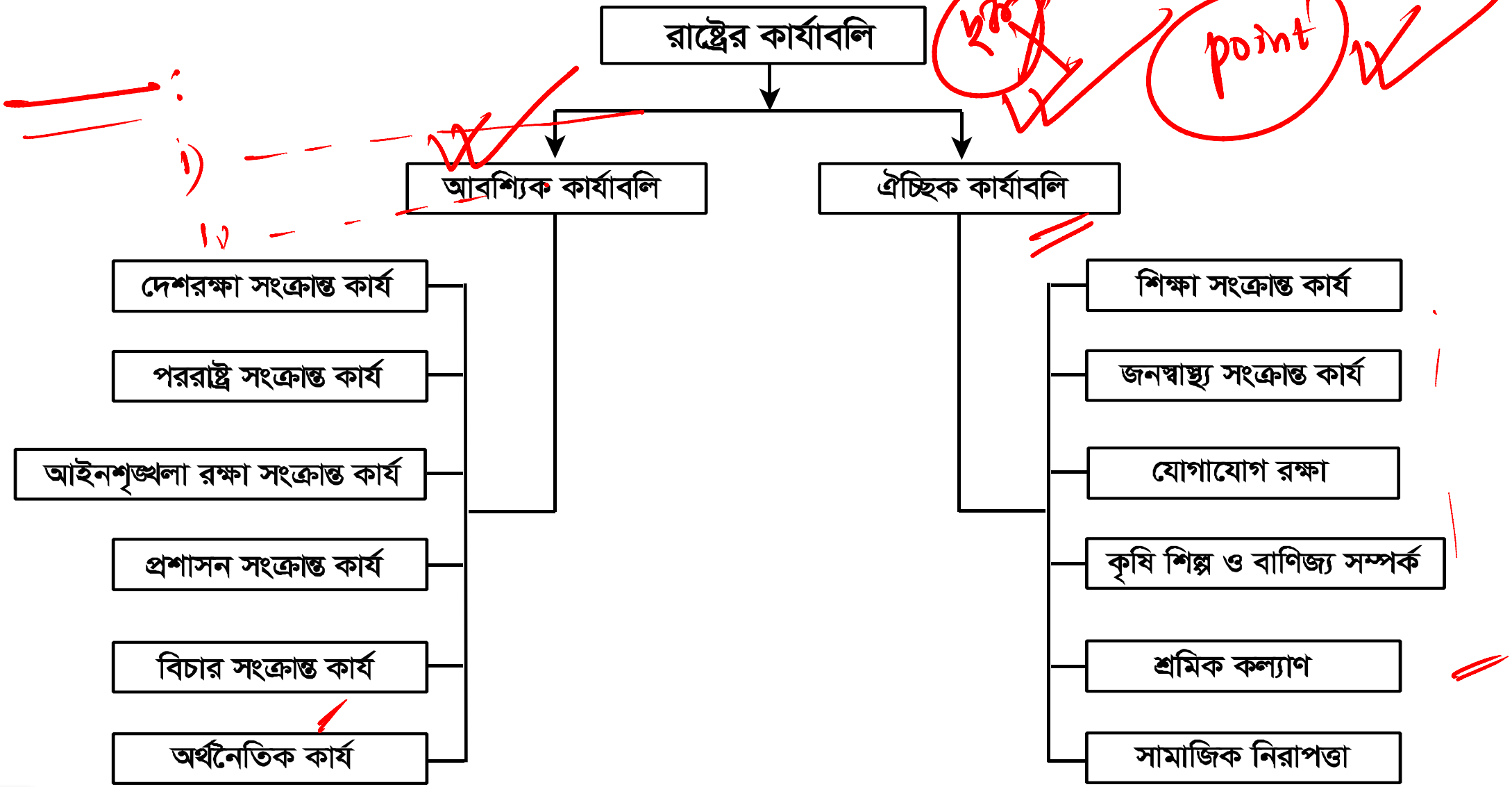
রাষ্ট্রের কার্যাবলি
আবশ্যিক কার্যাবলি
ঐচ্ছিক কার্যাবলি
দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্য
পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য
আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্য
প্রশাসন সংক্রান্ত কার্য
বিচার সংক্রান্ত কার্য
অর্থনৈতিক কার্য
শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য
জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য
যোগাযোগ রক্ষা
কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্ক
শ্রমিক কল্যাণ
সামাজিক নিরাপত্তা

আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাডাম স্মিথ তার বিখ্যাত "An Inquiry into Nature and causes of the wealth of Nations" গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রধান ৩টি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. **বাহ্যিক নিরাপত্তা:** অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ হতে স্বীয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করা।

২. **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা:** রাষ্ট্রের কোনো সদস্যের অবিচার হতে সকলকে রক্ষা করা।

৩. **সর্বজনীন স্বার্থ রক্ষা:** রাষ্ট্র যাতে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে কার্য সম্পাদন না করে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

conceptual issue

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন–

১. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

২. কল্যাণ সাধন করা।

৩. অন্য রাষ্ট্রসমূহে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ সাধন করা।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

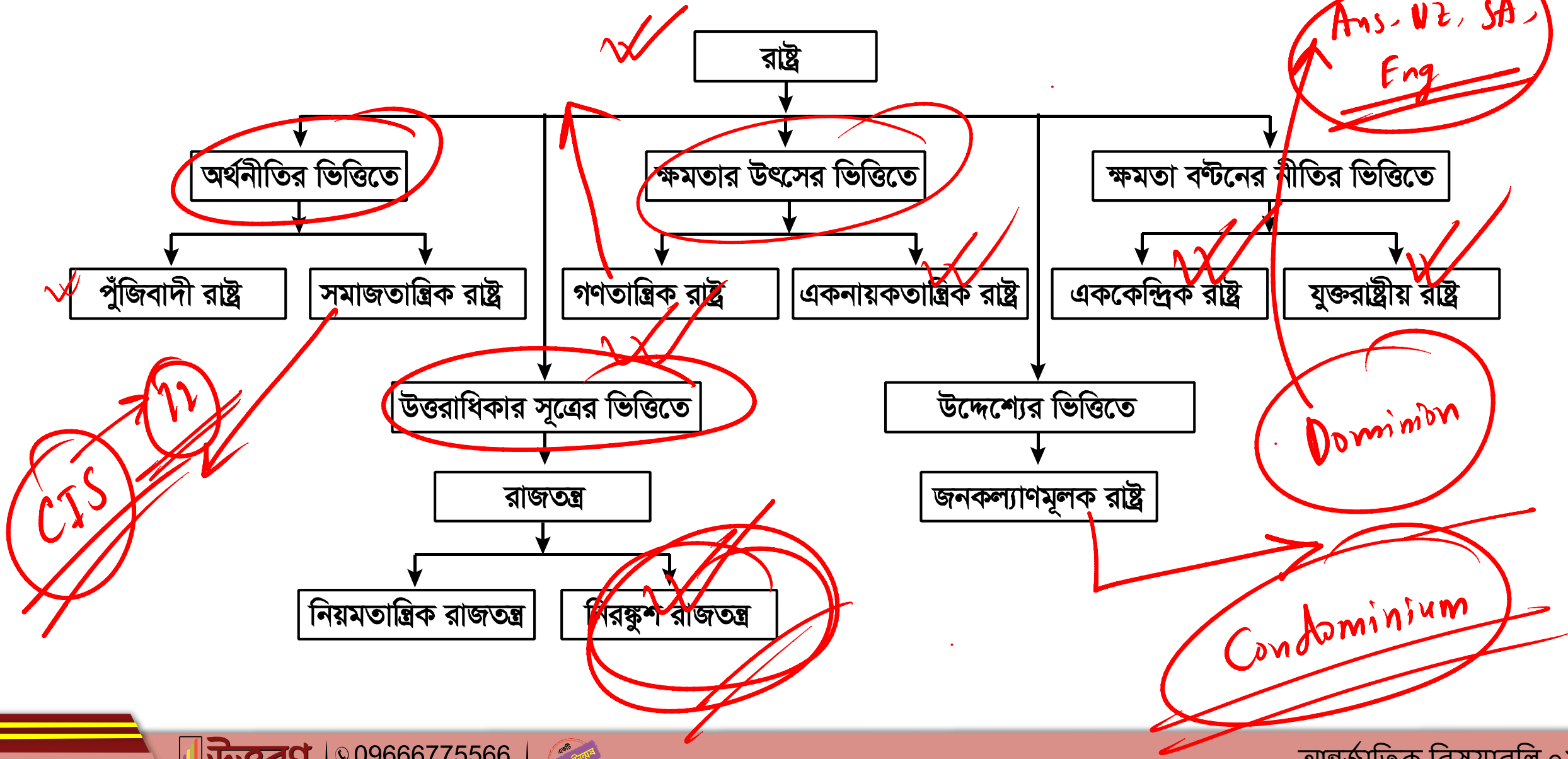

অর্থনীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র: পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির উপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকার ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী। যুক্তরাষ্ট্রকে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধারক বলা হয়। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং কানাডা হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

বৈশিষ্ট্য:

- অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে যার ফলে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়।
- রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন।
- ব্যক্তি মালিকানা থাকায় সরকারের হস্তক্ষেপ থাকে না।
- ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। যেমন- রাশিয়া, চীন এবং কিউবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

বৈশিষ্ট্য:

- এ ধরনের রাষ্ট্রে একটি মাত্র দল থাকে।
- গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- বিরোধপূর্ণ মত প্রকাশের সুযোগ থাকে না।
- ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

ক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র: যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে সকল জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদিসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে।

বৈশিষ্ট্য :

- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে।
- এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়।
- একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র: একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। এ ব্যবস্থায় শাসকের কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না। এই দলের নেতাই সরকারপ্রধান। তার ইচ্ছা অনুযায়ী দল পরিচালিত হয় এবং তার অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও ইতালি প্রভৃতি দেশ একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থার অধীনে ছিল।

বৈশিষ্ট্য:

- এ শাসন ব্যবস্থায় সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্বিত হয়।
- এ ব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।
- একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়।
- এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ।

ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র: এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ফলে কেন্দ্র থেকে দেশ পরিচালনা করা হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলে ভাগ করে কিছু ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় সরকার সে ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। যেমন, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য:

- রাষ্ট্রগুলো আকারে ছোট ও জনসংখ্যা কম হয়।
- কেন্দ্রীয় শাসন বিদ্যমান থাকে।
- কেন্দ্রীয় সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র: যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে, তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র বলে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। এ রাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতগুলো ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার সম্পদ আহরণ করে একটি বৃহৎ অর্থনীতি গঠনপূর্বক রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই বিশ্বের সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র কম-বেশি উন্নত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র।

বৈশিষ্ট্য:

- রাষ্ট্রগুলো আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহৎ হয়।
- প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যমান থাকে।
- কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতার বণ্টন হয়।

উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

বিশ্বের কোনো কোনো রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা লাভ করে। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের রাজা বা রানি হয়ে থাকে। রাজতন্ত্র দুই ধরনের, যথা-

১. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ২. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র: এ ধরনের রাষ্ট্রে রাজা বা রানি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এতে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যা নগণ্য। সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র: এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন। কিন্তু তিনি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। যুক্তরাজ্যে (গ্রেট ব্রিটেন) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

Welfare State

কল্যাণমূলক/নৈতিক রাষ্ট্র: সাধারণত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণকারী রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত। সমাজবিজ্ঞানী T.H. Marshal তাঁর ১৯৪৯ সালে Citizenship and Social Class নামক এক নিবন্ধে গণতন্ত্র, কল্যাণ ও পুঁজিবাদের ধারণার আলোকে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। উদাহরণ: কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম, নর্ডিক দেশসমূহ ইত্যাদি।

এ ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো –

- রাষ্ট্র সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। রাস্তাঘাট, এতিমখানা, সরাইখানা, খাদ্য ভর্তুকি প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বেকার ভাতা, অবসরকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি প্রদান করে।
- সচ্ছলদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে ও কম সচ্ছলদের উপর কম কর ধার্য করে দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
- কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে।
- সমবায় সমিতি গঠন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন করে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।
- জনগণের মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে।
- আইন শৃঙ্খলা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে থাকে।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে যৌথ সরকারি চুক্তি থাকে।

সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (BUFFER STATE)

দুটি বৃহৎ এবং বিপরীতমনা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যা সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতে রাষ্ট্র দুটোকে নিবৃত্ত করে তাকে বাফার স্টেট বলে। দুটি বৃহৎ শক্তিশালী দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে অনেক সময় বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক Palmer & Perkins বলেছেন,

"দ্বিমুখী শক্তিসম্পন্ন বিশ্বে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো একে অপরের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে আসে, সেখানে সংঘর্ষ নিবারক অঞ্চল ও নিরপেক্ষ এলাকা ব্যতীত শক্তিসাম্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক।"

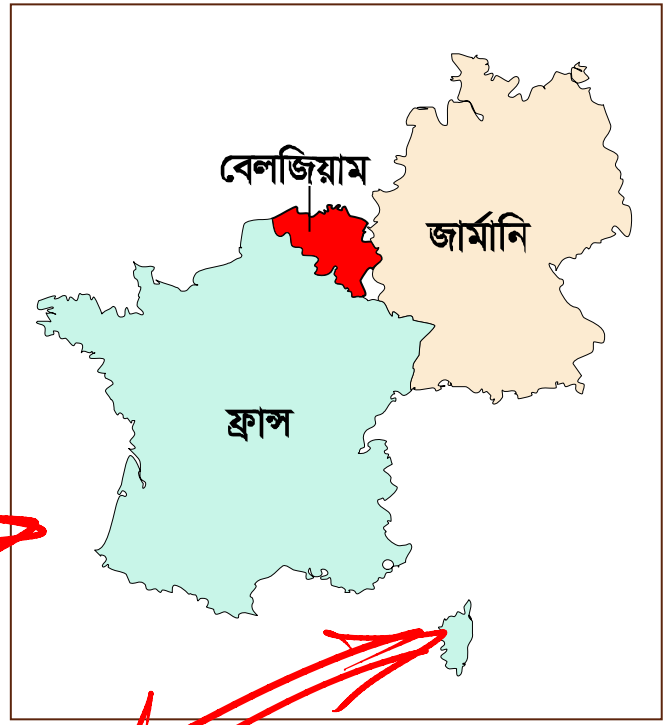

বৈশিষ্ট্য

১. সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্রটির পার্শ্ববর্তী দুটি রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সংঘাতময় হবে।
২. রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বিরোধের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে।
৩. রাষ্ট্রটি অবশ্যই স্বাধীন হবে।
৪. রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকবে।
৫. শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রটি ভূমিকা রাখে।
৬. কখনো কখনো এটি উপগ্রহ রাষ্ট্রের (Satellite State) মতো আচরণের শিকার হয়।

উদাহরণ: ২টি বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম ও দ্বিতীয়) সময় সংঘাতময় জার্মানি ও ফ্রান্সের মাঝে বেলজিয়াম, দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মাঝে প্যারাগুয়ে ছিল Buffer State।

দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (ROGUE STATE)

Rogue

দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বলতে বোঝায় সে সমস্ত দেশ যাদের অনুসৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আদর্শিক ভিত্তি, নেতৃত্ব যা সাধারণ আচরণের জন্য কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয় এবং বিশ্বব্যাপী তাদের বিতর্কিত আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ায় নিয়োজিত থাকে। এ সমস্ত সরকারের বৈধতাও প্রশ্নের সম্মুখীন কেননা তাদের ধরা হয় যে তারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সমাজে স্বীকৃত আচরণের পক্ষপাতি নয়। এক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার (১৯৪৮-১৯৪৯) নাম উল্লেখ করা যায় তারা সমস্ত ধরনের মানবিক ও আন্তর্জাতিক আইন কানুনকে তোয়াক্কা না করেই বর্বর বর্ণবাদী আইনকে বাস্তবায়ন করে। এ ধরনের ক্যাটাগরিতে পড়ে ইসরাইল, তাইওয়ান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও লিবিয়া প্রভৃতি দেশ।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রভাবশালী রাষ্ট্র/রাষ্ট্রসমূহ তাদের কথিত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দেশকে উক্ত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে কিউবাকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আসছে।

কলা প্রজাতন্ত্র (BANANA REPUBLIC)

রাজনৈতিকভাবে ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে কলা প্রজাতন্ত্র বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই শব্দটি রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল বিশেষত কলার মতো একমাত্র রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইংরেজি অক্সফোর্ড শব্দকোষ অনুসারে কলা প্রজাতন্ত্র হলো-

"অর্থনীতি বিদেশি পুঁজি নিয়ন্ত্রিত একটি একক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল একটি একক রাষ্ট্র।"

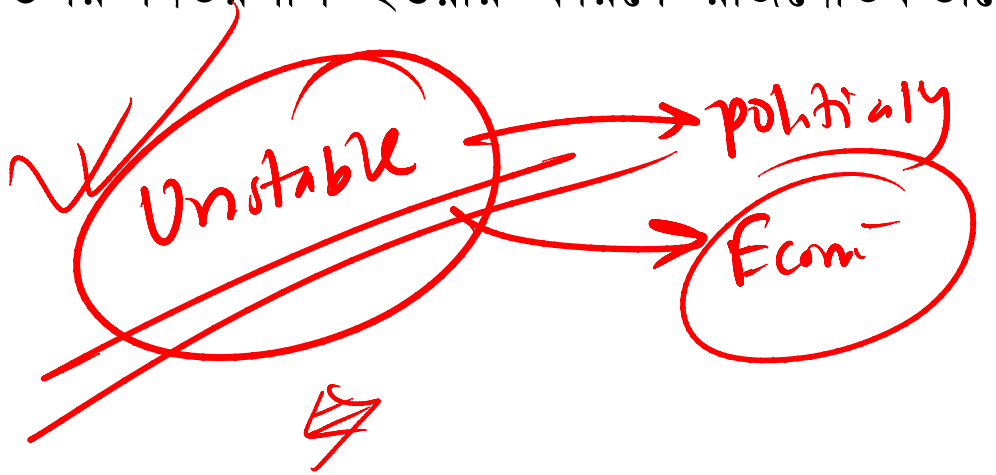

বৈশিষ্ট্য:

- রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল রাষ্ট্র।
- রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবকাঠামো অকার্যকর।
- একক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল।
- সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।
- অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া ধরনের অবস্থা বিরাজ করে।

উপগ্রহ রাষ্ট্র (SATELLITE STATE)

➲ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল রাষ্ট্রটিকে উপগ্রহ রাষ্ট্র বা Satellite State বলে। রাষ্ট্রটি ইতোমধ্যে স্বাধীন তবে অন্য একটি বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়। গ্রহকে কেন্দ্র করে যেমন উপগ্রহ ঘোরে, তেমনি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল/ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমর ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোনো রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে রাষ্ট্রটিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উপগ্রহ রাষ্ট্র বা Satellite State বলা হয়।

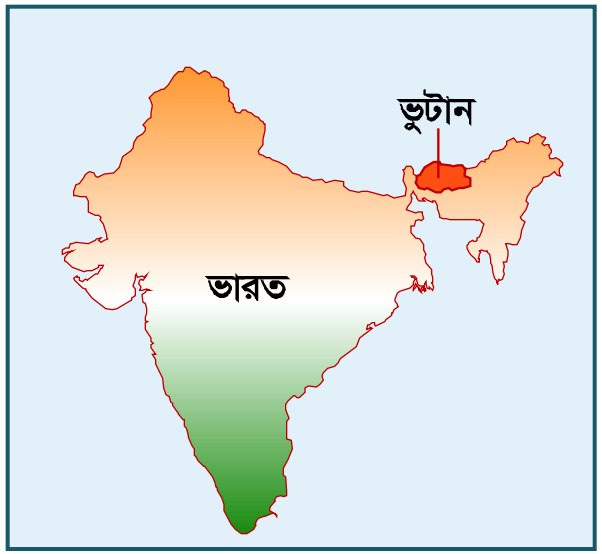

উদাহরণ: স্যাটেলাইট রাষ্ট্রের ধারণাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় স্নায়ুযুদ্ধের সময়। তখন পাশ্চাত্যে পরিভাষাটি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলোকে বোঝানো হতো। বর্তমানে সৌদির কাছে বাহরাইন ও ভারতের কাছে ভুটান উপগ্রহ রাষ্ট্র বলে বিবেচিত।

ব্যর্থ রাষ্ট্র ও ভঙ্গুর রাষ্ট্র

ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রত্যয়টির প্রথম ধারণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান ডকট্রিন নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ডলার কূটনীতি (Dollar diplomacy) চালু করে। ডলার কূটনীতির মাধ্যমে যেসব দেশ মার্কিন সাহায্য নিয়েও ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি, সেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছে। ২০০১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সর্বপ্রথম ব্যর্থ রাষ্ট্রের ধারণা প্রদান করেন।

অর্থাৎ, ব্যর্থ রাষ্ট্র হলো এমন এক ধরনের রাষ্ট্র যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে অর্থনৈতিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি পেয়েও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি।

বুশ প্রশাসন অনুযায়ী ব্যর্থ রাষ্ট্রের উপাদান হলো–

- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দান ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন।
- অবৈধ ও ব্যাপক চোরাচালানি বা মাদক ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংসের উৎস।
- অবৈধ অস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র।

বৈশিষ্ট্য

এসব দেশ বৈদেশিক সাহায্য পাবার পরেও –

- অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টাতে পারেনি।
- জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে পারেনি।
- কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছাড়াই দিনের পর দিন চলছে।
- নিজেদের GDP বাড়াতে পারেনি।
- রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল।
- মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভ্যালু বা মূল্য অনুপস্থিত।

উদাহরণ: গ্রিস। দেশটি ট্রুম্যান ডকট্রিনের অধীন ৪০ লাখ ডলার সাহায্য নিয়েও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি।

তবে ২০১৪ সালের সূচকে বলা হয়েছে, তারা আর কোনো রাষ্ট্রকে ফেইল্ড বলবে না, বলবে Fragile বা ভঙ্গুর। Fragile স্টেট হচ্ছে যারা উন্নয়নশীল এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খায়। সাধারণত একটি রাষ্ট্রের শাসনগত ১২টি দিক বিবেচনা করে রাষ্ট্রের বিভাজন করে থাকে, এতে শাসনগত ১২টি ক্যাটাগরির আওতায় শতাধিক সাব-ক্যাটাগরি করেছে।

১২ ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে –

১. জনসংখ্যাগত চাপ

২. উদ্বাস্তু হয়ে দেশত্যাগ ও স্থানান্তর

৩. উত্তেজনা ও সহিংসতা

৪. অভিবাসন ও মেধা পাচার

৫. অসম উন্নয়ন

৬. দারিদ্র্য ও মন্দা

৭. রাষ্ট্রের বৈধতা

৮. সরকারি সেবা

৯. মানবাধিকার

১০. নিরাপত্তা ব্যবস্থা

১১. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং

১২. বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

বহুজাতিক রাষ্ট্র

বহুজাতিক রাষ্ট্র হলো দুই বা ততোধিক জাতি বা রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত। এটি জাতিরাষ্ট্রের বিপরীত ধারণা। জাতি রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিপুল নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে, আর বহুজাতিক রাষ্ট্রের অনেকগুলোর জাতির সমন্বয়ে গঠিত হয়। ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, ধর্ম ও ঐতিহ্যগত মিল রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীকে জাতি বলে। যদি একটি দেশ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এবং পরস্পর নিরাপত্তার জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনে আগ্রহী হয়, তাকে বহুজাতিক রাষ্ট্র বলে।

❑ **Alain Dieckhoff এর মতে,**

"The term 'Multinational' state is often used to cover too wide a range of states"

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড স্ব-শাসনের লক্ষ্যে বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিকে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে বলে, তারা বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

বৈশিষ্ট্য

- বহুজাতিক রাষ্ট্রে বহুধর্মের, বহুবর্ণের, বহুভাষার মানুষ বসবাস করে।
- এক ও অভিন্ন জাতীয়তাবোধে তারা উদ্বুদ্ধ।
- নৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তা অপেক্ষা রাষ্ট্রিক রাজনৈতিক জাতীয়তা বিদ্যমান।
- রাষ্ট্রের নিজস্ব একটাই পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

উদাহরণ: আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত। ভারতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী মিলে একটি জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে।

বহুরাষ্ট্রিক জাতি (MULTI-NATION STATE)

একই সংস্কৃতির আওতায় অনেকগুলো দেশের জনগণকে একত্রে বহুরাষ্ট্রিক জাতি বা Multi-Nation State বলে। যেমন, জার্মান জাতি বলতে জার্মান ভাষায় কথা বলে এমন জাতিকে বোঝায়। সেক্ষেত্রে, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের জনগণকে বহুরাষ্ট্রিক জাতি বলে।

First state, Second state, Third state, Fourth state, Fifth Column

First state - একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতাধীন দলকে First state বলে। যেমন – বর্তমানে আওয়ামী লীগ First state.

Second state - দেশের প্রধান বিরোধীদলকে Second state বলে। যেমন – বর্তমানে জাতীয় পার্টি Second state.

Third state - দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের Third state বলে। যেমন – ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ভারতের অমর্ত্য সেন।

Fourth state - দেশের প্রধান জাতীয় সংবাদপত্র/গণমাধ্যমগুলোকে Fourth state বলে।

Fifth Column - নিজ দেশ বা সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে জড়িত ও শত্রুকে সহায়তা প্রদানকারী গোষ্ঠীকে Fifth Column বলে। যেমন – বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠী।

PILOT FISH BEHAVIOUR

পাইলট এক ধরনের মাছ যা ক্যারিবীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই মাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বড় হাঙ্গরের গা ঘেঁষে চলে এবং হাঙ্গরের গায়ে জমা শেওলা খেয়ে বেঁচে থাকে। হাঙ্গর এই মাছগুলোকে খেতে পারে না।

পাইলট ফিস Behaviour বলা হয় এমন একটি অবস্থাকে যখন একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে যাতে করে দেশটি বৃহৎ শক্তির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে টিকে থাকতে পারে। অনেক সময় এভাবেই তারা বৃহৎ রাষ্ট্রকে আস্থায় নিয়ে টিকে থাকে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্থান করে নেয়।

এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বিশেষজ্ঞ Erling Bjol. তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের এই আচরণকে Pilot Fish Behaviour নামে আখ্যায়িত করেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে Keep close to the shark to avoid being eaten. অর্থাৎ হাঙ্গরের পাশাপাশি থাকো যাতে হাঙ্গর তোমাকে খেতে না পারে।

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী নর্ডিকভুক্ত দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক কীভাবে রক্ষা করবে এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি Pilot Fish Behaviour এর তত্ত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পাইলট মাছ যেভাবে আচরণ করে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সেভাবে আচরণ করা উচিত। যাতে করে বড় রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করতে না পারে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সাথে পার্শ্ববর্তী বড় দেশের সম্পর্কের প্রশ্নে এই তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়।

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য

রাষ্ট্র	সরকার
১. রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ও বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে আমরা চোখে দেখি না।	১. যাদেরকে নিয়ে সরকার গঠিত হয় সেই মানুষগুলো মূর্ত।
২. রাষ্ট্র হলো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জন সমষ্টিকে বোঝায় যারা বাইরের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত।	২. সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান যা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
৩. রাষ্ট্রের কিছু স্বতন্ত্র মতাদর্শ থাকে। সংবিধানের মূলনীতি গুলো হলো রাষ্ট্রের মতাদর্শ।	৩. সরকারের আদর্শ ভিন্ন হতে পারে। সরকারের কাজ রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা।
৪. রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা যায় না। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অর্থ নতুন রাষ্ট্র তৈরি করার প্রচেষ্টা করা।	৪. সরকার সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে সরকারের বিরোধিতা করা যায় এবং প্রয়োজনে সরকার পরিবর্তন করা যায়।
৫. রাষ্ট্র বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন।	৫. সরকার রাষ্ট্রের তুলনায় ক্ষুদ্র সংগঠন।
৬. রাষ্ট্র স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।	৬. সরকার পরিবর্তনশীল।
৭. রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান ৪টি।	৭. সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান।
৮. রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড রয়েছে। সেই ভূ-খণ্ডের সকল অধিবাসী রাষ্ট্রের সদস্য।	৮. রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় সদস্যের অংশগ্রহণে গঠিত প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠান হলো সরকার।
৯. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে।	৯. সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে মাত্র।
১০. আগে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।	১০. পরে সরকার তৈরি হয়।
১১. রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা থাকে।	১১. সরকারের ভৌগোলিক সীমানা থাকে না।

সার্বভৌমত্ব (SOVEREIGNTY)

রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের একক, অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

- Jean Bodin বলেন,

  "Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects unrestrained by law" অর্থাৎ "নাগরিক ও প্রজাদের ওপর আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত চরম ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা।"

- অধ্যাপক ডব্লিউ এফ উইলোবি বলেন,

  "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।"

- জন অস্টিন সার্বভৌমত্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন,
  "The Sovereign is defined as a person (or determinate body of persons) who receives habitual obedience from the bulk of the population, but who does not habitually obey any other (earthly) person or institution." অর্থাৎ "যদি কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে এবং সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তবে উক্ত সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সার্বভৌম এবং উক্ত সমাজ রাজনৈতিক ও স্বাধীন।"
  ১৬৪৮ সালে Peace of Westphalia এর মতে, "State must be Soverergn."

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায় –

- সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা,
- সার্বভৌমত্ব সর্বজনীন,
- সার্বভৌম একক ও অবিভাজ্য ক্ষমতা,
- সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য কর্তৃত্ব,
- আইনগত দিক হতে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে মৌলিক, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতা প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায় সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা, যে ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংঘ, প্রতিষ্ঠান, জনসমষ্টি প্রভৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাহ্যিক ক্ষমতাবলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব (Constitutional Sovereignty)

আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায়, সার্বভৌমত্বের ধারণাকে যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের ধারণা অন্যতম। সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের ধারণার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদের প্রাধান্য। আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং সরকারের অপরাপর অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আইনসভার আধিপত্য বজায় থাকবে। সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন ইত্যাদি সবকিছুই আইনসভার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের ধারণা মূলত সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে সংসদই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সপ্তদশ শতাব্দীতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার খ্যাত দেশ ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম সার্বভৌম সংসদ বা সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের ধারণার উদ্ভব ঘটে।

বৈশিষ্ট্য

সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়—

- **সংবিধান প্রণয়ন:** রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে সার্বভৌম সংসদের হাতে।
- **লিখিত সংবিধান:** আইনসভা প্রণীত সংবিধান অবশ্যই লিখিত ও সুপরিবর্তনীয় হবে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে ব্রিটিশ সংবিধান।
- **আইন প্রণয়ন:** রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন প্রণয়ন করবে জাতীয় সংসদ এবং প্রয়োজনে এই আইনের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন ও সংশোধনের ক্ষমতাও থাকবে সংসদের হাতে।
- **আইনের বৈধতা যাচাই:** সংসদ কর্তৃক পাসকৃত আইনের বৈধতা যাচাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালত থাকবে যারা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে আইনের বৈধতা যাচাই বাছাই করবে।
- **আইনসভার প্রাধান্যের স্বীকৃতি:** সংবিধান কর্তৃক আইনসভার প্রাধান্য স্বীকৃত হবে এবং সংসদের কোনো কাজ কর্মের বৈধতা নিয়ে বিচার বিভাগ কোনো রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।
- **প্রণীত আইনের অনন্যতা:** এক সংসদ কর্তৃক পাসকৃত আইন ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী কোনো সংসদ কোনো অবস্থাতেই বাতিল করতে পারবে না।

বিভিন্ন ধরনের সার্বভৌমত্ব

ডি-জুরি (De-Jure) ও ডি-ফ্যাক্টো (De-Facto) সার্বভৌমত্ব

ডি-জুরি (De-Jure) সার্বভৌমত্ব

ডি-জুরি শব্দটি ল্যাটিন ভাষার শব্দ, যার অর্থ আইনগত। ডি-জুরি সার্বভৌমত্ব অর্থ রাষ্ট্রের আইনগত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে। আমরা জানি, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। এই চারটি মৌলিক উপাদান বাদেও রাষ্ট্রের আরও একটি উপাদান রয়েছে। সেটিকে আমরা পঞ্চম বা গৌণ উপাদান বলতে পারি। সেটি হলো স্বীকৃতি। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলতে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক আইনগত স্বীকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রকেই বোঝায়। যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি ডি-জুরি রাষ্ট্র।

ডি-ফ্যাক্টো (De-Facto) সার্বভৌমত্ব

ডি-ফ্যাক্টো শব্দটিও ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ কার্যত। ডি-ফ্যাক্টো সার্বভৌমত্ব অর্থ কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্র। এই ধরনের সার্বভৌম রাষ্ট্রেও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান থাকবে। তবে এর পঞ্চম বা গৌণ উপাদানটি সীমিত থাকে বা থাকে না। অর্থাৎ অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক আইনগত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এখানে অনুপস্থিত থাকে। পৃথিবীতে এমন অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যারা অন্যান্য আইনগত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি। রাষ্ট্রের এই ধরনের পরিস্থিতিকে বলা হয় ডি-ফ্যাক্টো সার্বভৌমত্ব। যেমন: কসোভো, তাইওয়ান প্রভৃতি।

ডি-জুরি সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ এর অভ্যন্তরে এবং বাইরে স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করে। অপরদিকে ডি-ফ্যাক্টো সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ এর অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে থাকলেও বাইরে স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়।

সার্বভৌমত্ব/ সার্বভৌম ক্ষমতা ও সার্বভৌম সমতার মধ্যে পার্থক্য

সার্বভৌম ক্ষমতা/ সার্বভৌমত্ব	সার্বভৌম সমতা
রাষ্ট্রের মৌলিক ও চরম ক্ষমতা যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়।	আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম অধিকার লাভ করাকে সার্বভৌম সমতা বলে।
এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অধীনে থাকা জনসমষ্টি ও সকল সংস্থার আনুগত্য লাভ করে।	এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্র সমান অধিকার লাভ করে।
এর মাধ্যমে রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে সামরিক, কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক চুক্তি ও সন্ধি স্থাপন করতে পারে।	এর মাধ্যমে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় অংশগ্রহণের সমান অধিকার লাভ করে।
এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করতে পারে।	এর মাধ্যমে সরকার তার বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে প্রয়োগ করে।

OIC,,

Organization of Islamic Co-operation (OIC)

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা Organization of Islamic Co-operation (OIC) হলো বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সংগঠন। সংস্থাটি ৫৭ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত যার ৪৯টি মুসলিম দেশ। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে মুসলিমদের পবিত্র আল আকসা মসজিদে ইসরায়েলের আক্রমণ ও আগুন দেওয়ার প্রেক্ষিতে সংস্থাটি গঠিত হয়।

OIC-এর ভূমিকা

- **ঐক্য ও সংহতি:** OIC তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজ করে। কারণ মুসলিম বিশ্বের এখন সবচেয়ে দুঃসময় আর এ দুঃসময়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একান্ত অবশ্যম্ভাবী। রাবাত থেকে পুত্রজায়া পর্যন্ত প্যান ইসলামিক ধারণার ভিত্তিতে যে ইসলামিক আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাকে ধারণ ও লালন করতে ঐক্য ও সংহতি একান্ত আবশ্যক।
- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** ইসলামি বিশ্বে মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ, বিশ্বের মোট তেল সম্পদের ৬০ শতাংশ রয়েছে এবং এ ব্লকে তাদের ৪০ শতাংশ কাঁচামাল রপ্তানি করে। কিন্তু এই দেশগুলোর সম্মিলিত আয় বিশ্বের মোট উৎপাদনের পাঁচ শতাংশেরও কম। তাই OIC এর ধনী সদস্যদের পেট্রোডলার এবং গরীব সদস্য দেশগুলোর শ্রম ও মেধার সমন্বয় করে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো শক্তিশালী অবস্থানে নেওয়ার জন্য ভূমিকা পালন করছে।
- **শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন:** মুসলিম দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে OIC মুসলমানদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করছে। বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, উগান্ডা ও মালয়শিয়াতে OIC পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। এগুলোতে সারা পৃথিবী থেকে মুসলিম শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার সুযোগ পায়।
- **অমুসলিম দেশসমূহের সম্পর্ক রক্ষা:** বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে পৃথিবীর কোনো দেশই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। তাই অবাধ বাণিজ্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সুফল গ্রহণ করতে OIC অন্যান্য অমুসলিম দেশ এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে।

Organization:

i) full meaning -

ii) year

iii) HQ

iv) member

v) achievement

vi) মহাসচিব

আরব লীগ

আরব লীগ আরব দেশসমূহের সংস্থা। ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ আরব লীগ গঠিত হয়। মিশরের রাজধানী কায়রোতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৭টি (মিশর, জর্ডান, ইরাক, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া ও ইয়েমেন (ইয়েমেন ৫ মে যোগদান করে)। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২। এর বর্তমান মহাসচিব মিশরের আহমেদ আবুল ঘেইত (১ জুলাই, ২০১৬ – বর্তমান)।

উদ্দেশ্য:

- আরব রাষ্ট্রসমূহের ভৌগোলিক সংহতি রক্ষার জন্য সমষ্টিগতভাবে কাজ করা।
- বিদেশি শক্তির দখল থেকে আরব জনগণ তথা আরব ভূ-খণ্ডকে মুক্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো।
- আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে কাজ করা।
- আরব রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃবিরোধসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়া।

প্রকৃতপক্ষে আরবলীগ তার উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এখনো আরব দেশসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে জটিলতা ও মতবিরোধ বিরাজমান রয়েছে ।

বিশ্ব ব্যাংক

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ঋণ বা আর্থিক সহায়তা একান্ত অপরিহার্য। দেশের নাগরিক সুবিধা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ দূর করতে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো বা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস-এ ৪৪টি দেশের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এবং আর্থিক কাঠামো ধরে রাখার জন্য ২টি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে International Bank for Reconstruction and Development বা IBRD বা বিশ্বব্যাংক। মাত্র ৪৪টি দেশ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৯। বিশ্বব্যাংক হচ্ছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের একটি গ্রুপ। এগুলো হলো:

IBRD : International Bank for Reconstruction and Development.
IDA : International Development Association.
IFC : International Finance Corporation.
MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency.
ICSID : International Centre for Settlement of Investment Disputes.

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস করা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিকাশ সাধন করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাংক হলো বিশ্ব পুঁজি ব্যবহারকারী মোড়লদের ফোরাম। পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থাকে দক্ষ ও কার্যকর রাখার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাওয়া এ সংস্থার প্রধান কাজ।

NATO

ন্যাটো শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সদস্যদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর প্রতিষ্ঠিত একটি সামরিক সহযোগিতার জোট।

ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য

১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল গঠিত হওয়া ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের হাত থেকে পশ্চিম বার্লিন এবং ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ন্যাটো একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা চুক্তি, যে চুক্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকারবদ্ধ। ন্যাটোর প্রথম মহাসচিব লর্ড ইসমে বলেছিলেন যে,
"এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ানদের দূরে রাখা, আমেরিকানদের কাছে আনা এবং জার্মানদের দাবিয়ে রাখা।"

নর্থ আটলান্টিক চুক্তির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে যৌথ প্রতিরক্ষা নীতির উল্লেখ আছে। এ অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে- যেকোনো এক সদস্যকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে জোটের সকল সদস্যের সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। বেশ কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র আছে যাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল। এসব সদসদের জন্য ন্যাটোর এই যৌথ প্রতিরক্ষা নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ: আইসল্যান্ডের কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই।

যেহেতু, USA ন্যাটোর সবচেয়ে বড় ও ক্ষমতাধর সদস্য, তাই জোটের যেকোনো দুর্বল সদস্য মার্কিন সুরক্ষা বলয়ের অধীনে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ন্যাটোর ৫ম অনুচ্ছেদের মাত্র একবার প্রয়োগ হয়েছিলো। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর USA তে জঙ্গি হামলার পর এ অনুচ্ছেদের আওতায় আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যোগ দেয় ন্যাটোর অন্যান্য সদস্যরা। তবে এর বাইরেও ন্যাটো অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়, ২০০৩ সালে ইরাক সংকটের সময় এবং ২০১২ সালে সিরিয়া পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ন্যাটো প্যাট্রিয়ট মিসাইল মোতায়নের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল। এই তিনবারই ন্যাটো তুরস্কের অনুরোধের ভিত্তিতে প্যাট্রিয়ট মিসাইল মোতায়েন করে।

"Midnight in the American Empire, How Corporations and Their Political Servants are Destroying the American Dream." বইয়ের মার্কিন লেখক ও সাংবাদিক রবার্ট ব্রিজ বলেন- "সম্প্রতি ইউক্রেনের ন্যাটোতে সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করেই ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে একপ্রকার টেনে আনা হয়েছে ন্যাটো ও আমেরিকার মাধ্যমে। এ থেকেও বোঝা যায় ন্যাটো তার উদ্দেশ্য পূরণে সব সময়ই কার্যকর ভূমিকা পালন করে।"

MNCS & TNCS এর পার্থক্য

Multinational Companies/Corporations	Transnational Companies/ Corporations
বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একাধিক দেশে কাজ করে এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকে।	আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সারা বিশ্বে অনেক শাখা কোম্পানি রয়েছে কিন্তু তাদের কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই।
একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন ও কার্যক্রম চালায়।	একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন ও কার্যক্রম চালায়।
কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে চলতে হয়।	কেন্দ্র নয় বরং শাখা অফিস থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।
বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একটি হোম কোম্পানি এবং এর সহায়ক সংস্থাগুলির মালিক।	ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানির সাব সিডিয়ারি নেই কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে।
উদাহরণ: ইউনিলিভার, পেপসিকো।	উদাহরণ: আমাজন, অ্যাপল।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। আলফ্রেড গ্রাজিয়ার (Alfred Grazier) – এর মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।"

Yron Weiner বলেছেন "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারি কাঠামোর বাইরে থাকে এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের মনোনয়ন ও নিয়োগ, সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।"

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

- বেসরকারি সংগঠন: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিবিশেষ।
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য।
- নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন: চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়।
- সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী: স্বার্থকামী গোষ্ঠী সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী। তাঁরা সুসংগঠিত এবং তাঁদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট।
- সরকারকে নিয়ন্ত্রণ: স্বার্থকামী গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। এর লক্ষ্য হলো সরকারের নীতি ও আচরণকে প্রভাবিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এমন একটি জনসমষ্টি যাদের ব্যক্তিস্বার্থ থাকে না, ক্ষমতা দখলে উদ্দেশ্য থাকে না বরং তাদের উদ্দেশ্য জাতীয় স্বার্থোদ্ধার।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/N.G.O

এনজিও (N.G.O) হলো Non-Governmental organization শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। বর্তমানে বাংলা ভাষায় এনজিও শব্দটি বহুলবভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এনজিও বলতে বেসরকারি এবং স্বেচ্ছসেবী সংগঠনকে বোঝায়। এনজিওগুলো উন্নয়ন সহযোগী।

জাতিসংঘের মতে, The N.G.O as "a not for profit, voluntary citizen's group that is Organized on a Local, National or International level to Address issues in Support of the Public good."

N.G.O গুলোকে সাধারণত ৪টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়-

১. স্বেচ্ছাসেবী ২. নির্দলীয় ৩. অলাভজনক ৪. অ-অপরাধী

কাজ :

- স্থানীয় ও গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণ।
- সম্পদ সমাবেশ ও ক্ষুদ্র পুঁজি সংগ্রহ ও সমাবেশ।
- উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের বিনিয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও গুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

পরিশেষে বলা যায়, এনজিওগুলো মানব কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিস্তৃত পরিসরে সেবা দিয়ে থাকে। এই সংস্থাগুলো মানব উন্নয়ন ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে।

Responsibility to Protect (R_2P)

২০০৫ সালে বিশ্ব সামিট অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষায় মানবিক হস্তক্ষেপকে (Humanitarian Intervention) বৈধতা দিতে Responsibility to Protect (R_2P) কে স্বীকৃতি দেয়।

এ সম্মেলনে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলো- গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত নির্মূল ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। সেখানে আরও বলা হয় অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক আইন মাথায় রেখেই হস্তক্ষেপ বা Responsibility to Protect করা যাবে।

Responsibility to Protect (R_2P) ধারণাটি জাতিসংঘের ৬০তম বার্ষিক অধিবেশন দ্বারা গৃহীত হয়। Responsibility to Protect দ্বারা মূলত নাগরিকদের রক্ষায় রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বকে বোঝানো হয়েছে। একটি রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিরাপত্তার দায়িত্ব সাধারণত রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। তেমনি কোনো দেশের জনসংখ্যাকে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও জাতিগত নির্মূল থেকে রক্ষার দায়িত্বও থাকে রাষ্ট্রের ওপর। আর এই রাষ্ট্রসমূহের জনগণকে রক্ষায় সহায়তা করা রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি দায়িত্ব আছে যাকে বলা হয় Responsibility to Protect (R_2P)।

Responsibility to Protect (R_2P) এর স্তম্ভ:

R_2P এর স্তম্ভ মূলত তিনটি যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও জাতিগত উচ্ছেদ থেকে দেশের নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

২. উল্লিখিত বিষয়ে দায়িত্ব পালনে কোনো রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের।

৩. কোনো রাষ্ট্র যদি উল্লিখিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হবে সেই রাষ্ট্রের উপর। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা এবং সর্বশেষ উপায় হিসেবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা।

অর্থাৎ প্রথমটি ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি ব্যর্থ হলে তৃতীয় স্তম্ভটি কাজ করবে।

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (NON-STATE ACTORS)

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এমন কিছু সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গ আছেন যাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব রাখে, তাদের অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actors) বলে।

- পার্লম্যান এবং কানিংহাম এর মতে, "অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হলো একটা সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা সরাসরি রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে জড়িত।"

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের বৈশিষ্ট্য

- কোনো সুনির্দিষ্ট জনসমষ্টি, ভূ-খণ্ড, সার্বভৌমত্ব ও নির্বাচিত সরকার নেই।
- গণতান্ত্রিক ও বিশ্বনাগরিকের মতামতের উপর নির্ভরশীল।
- এদের কার্যাবলি শুধু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বজনগণের স্বার্থেও কাজ করে।
- এটি একটি শক্তিশালী, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
- এরা দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে তাদের প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের ধরন : অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (Non State Actors) প্রধানত ২ ধরনের। যথা –

ক. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা (IGO)

খ. আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারি সংস্থা (NGO)

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (NON-STATE ACTORS)

ক. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা (IGO)

- সামরিক সংস্থা - (উদাহরণ: NATO)
- অর্থনৈতিক সংস্থা - (উদাহরণ: ASEAN, OPEC)
- রাজনৈতিক ও বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক - উদাহরণ: জাতিসংঘ

খ. আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারি সংস্থা (NGO)

- অর্থনৈতিক বহুজাতিক সংস্থা (উদাহরণ: BIMSTEC)
- রাজনৈতিক (উদাহরণ: OIC, NAM, Commonwealth)
- ধর্মীয় উপাদান (উদাহরণ: ক্যাথলিক মিশন)
- উগ্রবাদী সংস্থা (উদাহরণ: আল-কায়েদা, আইএস)
- ব্যক্তি (উদাহরণ: বিল গেটস, ইলন মাস্ক)
- আদিবাসী সম্প্রদায় (উদাহরণ: মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মায়া সম্প্রদায়)
- NGO (উদাহরণ: BRAC, CARE International)
- আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (উদাহরণ: BBC News, The New York Times)

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হিসেবে স্বীকৃতির শর্তসমূহ

- অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা সংস্থাটিকে এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে যেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব বজায় থাকে।
- অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্ব দিতে হবে এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা স্বীকার করতে হবে।
- অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী নিজস্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে।

রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের মধ্যে সম্পর্ক

রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহ তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারে না। নন-স্টেট অ্যাক্টর জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য রাষ্ট্রের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং যাতে গুটি কয়েক ব্যক্তির স্বার্থে ব্যবহৃত হতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্র তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের বিভিন্ন রকমের কার্যক্রমের ফলে স্টেট ও নন-স্টেট অ্যাক্টরের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু সম্পর্ক নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হিসেবে বহুজাতিক সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক দুর্বল দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে নিজেদের অনুকূল অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা চালায়।

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শ্রমিক সংঘসমূহ রাষ্ট্রগুলোর ভিতরে ও সারা বিশ্বেই শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে শ্রমিকবান্ধব নীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রসমূহের সাথে কাজ করছে।

- বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হিসেবে রাষ্ট্রসমূহের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে। ধর্ম যেহেতু বিশাল সংখ্যক মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামতকে প্রভাবিত করে তাই রাষ্ট্রকেও প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়।

রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের মধ্যে সম্পর্ক

- বর্তমান কালে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন এবং তার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এই সকল সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণের সঙ্গে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিতে হয়। ফলে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

- বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর কার্যকলাপের দ্বারা রাষ্ট্রসমূহ প্রভাবিত হচ্ছে, তাদেরকে প্রতিহত করতে নতুন নতুন নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় কিছু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের অভিযোগ উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্য আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (I.R.A), সাইপ্রাসে গ্রীক ও তুর্কি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, শ্রীলঙ্কার L.T.T.E ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন যেমন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি, সন্ধি, সম্মেলন, পারস্পরিক বোঝাপড়া, কনভেনশন, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় প্রভৃতি অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হিসেবে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক আচরণ ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলে। এইসব আন্তর্জাতিক আইন না মেনে রাষ্ট্রগুলো যে যার ইচ্ছামত চললে পুরো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়বে ও নৈরাজ্য শুরু হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যদিও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহের রাষ্ট্রের মতো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই, তবুও রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তথাপি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় নন-স্টেট অ্যাক্টরের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি কিছু অধিক শক্তিশালী অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক কখনও কখনও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাতেও হস্তক্ষেপ করছে।

- ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য কী? আপনি কি মনে করেন ন্যাটো তার উদ্দেশ্য পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্ব ব্যাংক কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আরব লীগ কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- OIC-এর ভূমিকা কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- নৈতিক রাষ্ট্রের ধারণাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ভঙ্গুর রাষ্ট্র (fragile state) ও ব্যর্থ রাষ্ট্র (failed state)- এর মধ্যে পার্থক্য কী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- ট্রান্স-আটলান্টিক (Trans-Atlantic) সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- বহুজাতিক রাষ্ট্র বলতে কী বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actors) বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ‘ভূ-খণ্ড’ এবং ‘ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা’র মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কী? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (Nation-state) বলতে কী বুঝায়? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ও সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে তফাৎ কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- Responsibility to Protect (R_2P) কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- বহুজাতিক সংস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

শক্তি ও নিরাপত্তা

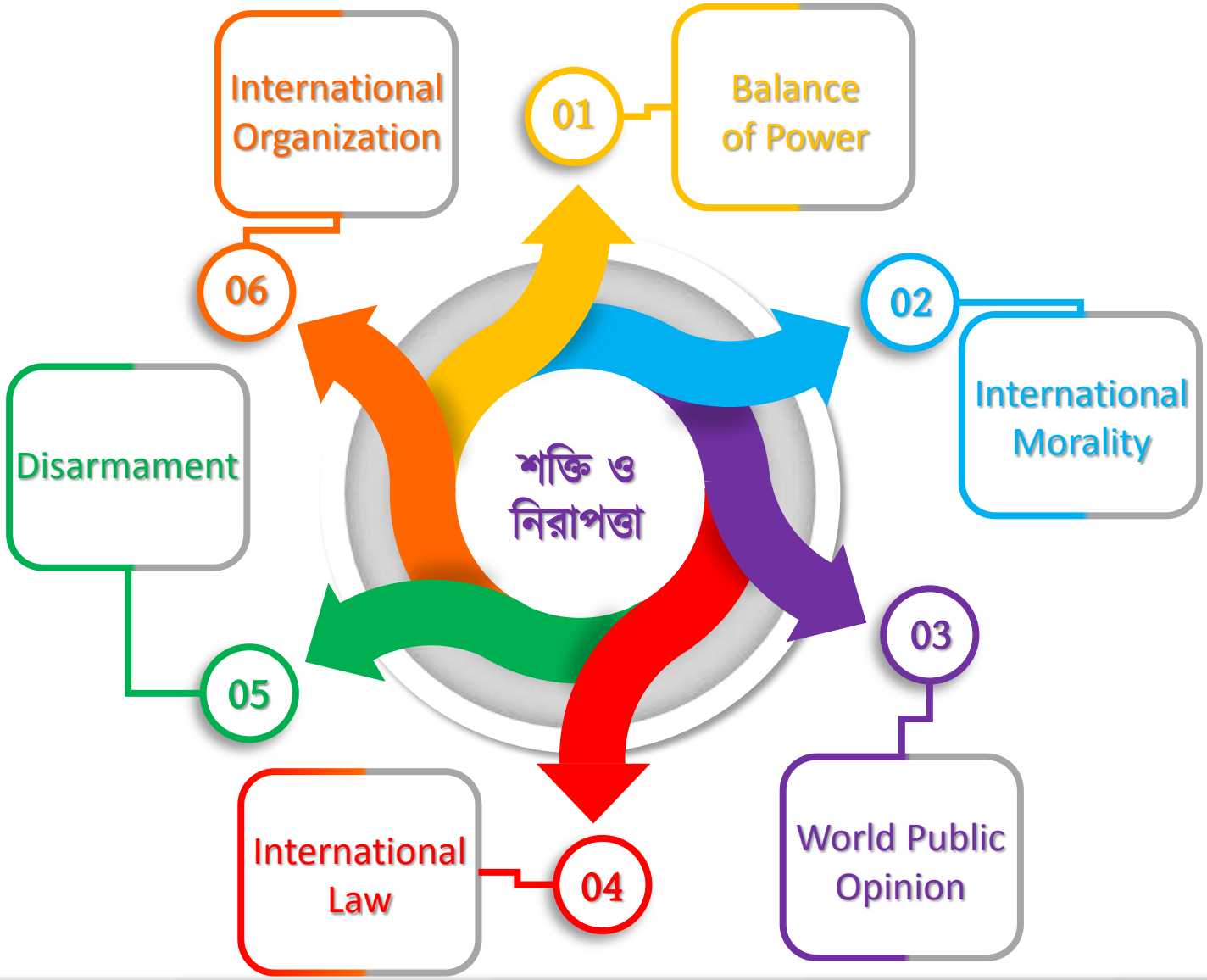
শক্তি ও নিরাপত্তা
01
Balance of Power
02
International Morality
03
World Public Opinion
04
International Law
05
Disarmament
06
International Organization

শক্তি ও নিরাপত্তা

- "Power is the ability to shape and control the political behaviour of others and to lead and guide their behaviour in the direction desired by the person, group or institution." – Dr. Amon Leroy.
- "A psychological relation between those who exercise it and those over whom it is exercised."– Morgantheau
- "Power is the capacity to impose one's will on others"– George
- "Reliance on effective sanctions in case of non-compliance. ।"– Schwargenbergar (Power politics)
- "National power is that combination of power and capability of state which the state uses for fulfilling its national interest and goals" – প্যাডল ফোর্ড ও লিঙ্কন
- "National power is the forcing capability of a state." – Peace of Westphelia
- "National power denotes the ability of a nation to fulfill national goals it tells us as to how much powerful or weak a particular nation is in securing its national goals." – Hartman

➲ শক্তি তিন প্রকার –

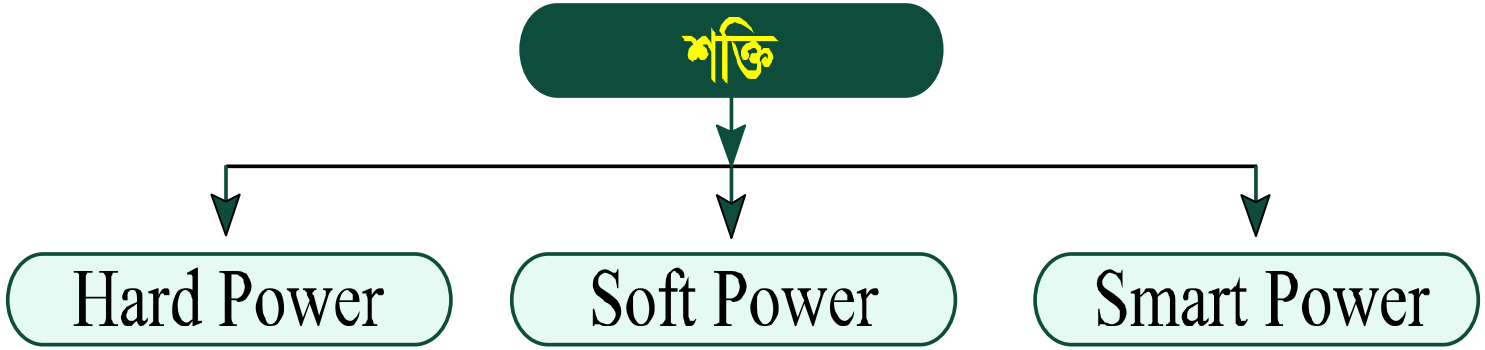

১. **Hard Power:** হার্ড পাওয়ার বলতে একটি রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে বোঝায়।

২. **Soft Power:** ক্যামব্রিজ ডিকশনারি অনুযায়ী সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার না করে একটি দেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে অন্যান্য দেশকে দিয়ে কোনো স্বার্থ আদায় করা বা প্রভাবিত করার ক্ষমতাই 'Soft power'।

৩. **Smart Power:** স্মার্ট পাওয়ার হচ্ছে হার্ড পাওয়ার ও সফট পাওয়ার এর মধ্যবর্তী একটি অবস্থান। জোসেফ নাই স্মার্ট পাওয়ারের ধারণা দিয়েছেন।

শক্তি ও নিরাপত্তা

❖ **জাতীয় শক্তির উপাদান:** অধ্যাপক পামার ও পারকিনস জাতীয় শক্তির সাত রকমের উপাদান উল্লেখ করেছেন।

হ্যানস মরগেনথউ শক্তির উপাদানগুলো দুভাগে ভাগ করেছেন-

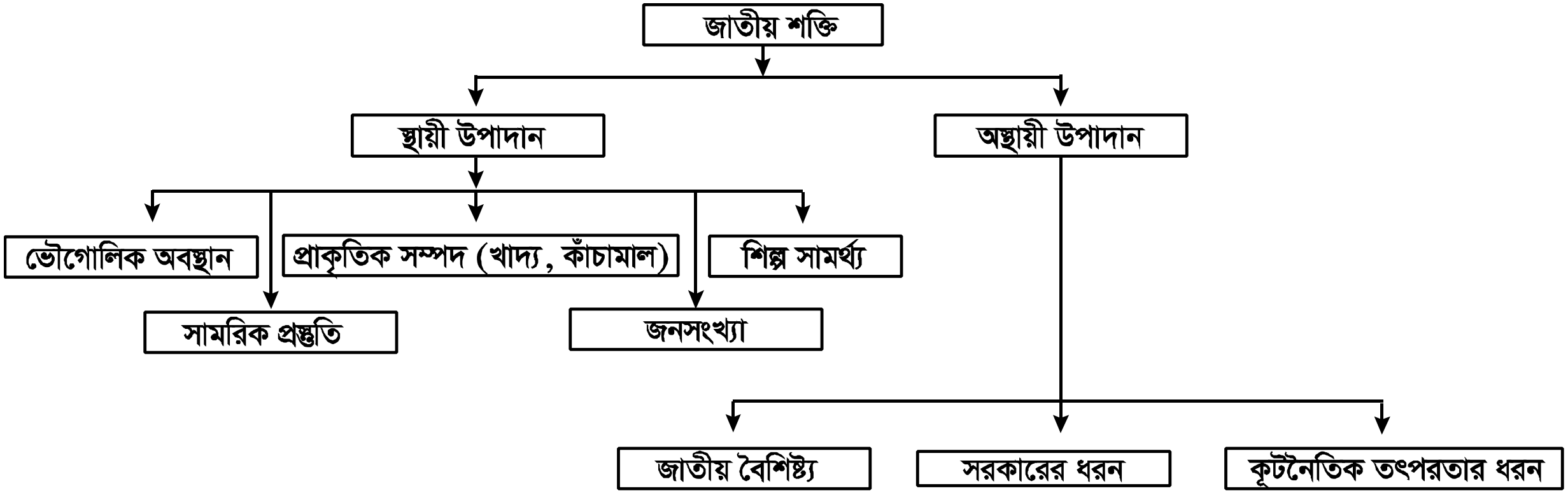

শক্তিসাম্য (BALANCE OF POWER)

- Quincy Wright এর মতে, "শক্তির ভারসাম্য হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে, কোনো রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলে তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপরাজেয় জোটের সম্মুখীন হতে হবে।" (It is a system designed to maintain a continuous conviction in any state that if it attempts aggression, it would encounter an invincible combination of other).
- Prof. George Schwarzenberger তাঁর 'Power Politics' গ্রন্থে বলেন, "Balance of power is a certain amount of stability in international relation." অর্থাৎ শক্তিসাম্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সাম্যাবস্থা।
- Prof. Sidney B. Fay এর মতে, "শক্তি-সাম্যের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা যেকোনো একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে যাতে সে অপরের উপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে।"

শক্তি-সাম্যের বৈশিষ্ট্য

পামার ও পারকিন্স শক্তিসাম্যের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যথা –

- ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু ধরনের ভারসাম্য।
- ক্ষমতার ভারসাম্য স্বল্প সময়ের জন্য বিরাজ করে।
- মানুষের সক্রিয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শক্তিসাম্য অর্জন করতে হয়।
- শক্তিসাম্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতার অবস্থানের স্থিতবস্থার পক্ষে।
- প্রকৃত শক্তিসাম্য খুব কমই বিদ্যমান থাকে। আর সাম্যের পরীক্ষা হয় যুদ্ধের মাধ্যমে।
- যেহেতু শক্তিসাম্য যুদ্ধকে সাম্য বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে তাই তা শান্তির প্রাথমিক উপায় নয়।
- শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় বড় বা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোই প্রধান খেলোয়ার। আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলো কেবল দর্শক বা খেলার ভুক্তভোগী।
- শক্তিসাম্য ব্যবস্থা তখন কাজ করে যখন বহুসংখ্যক প্রধান শক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে, যাদের প্রত্যেকে তাদের শক্তি সম্পর্কের মধ্যে সাম্য বজায় রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।
- জাতীয় স্বার্থই হলো শক্তিসাম্যের মূল ভিত্তি।

শক্তিসাম্য কেন প্রয়োজন?

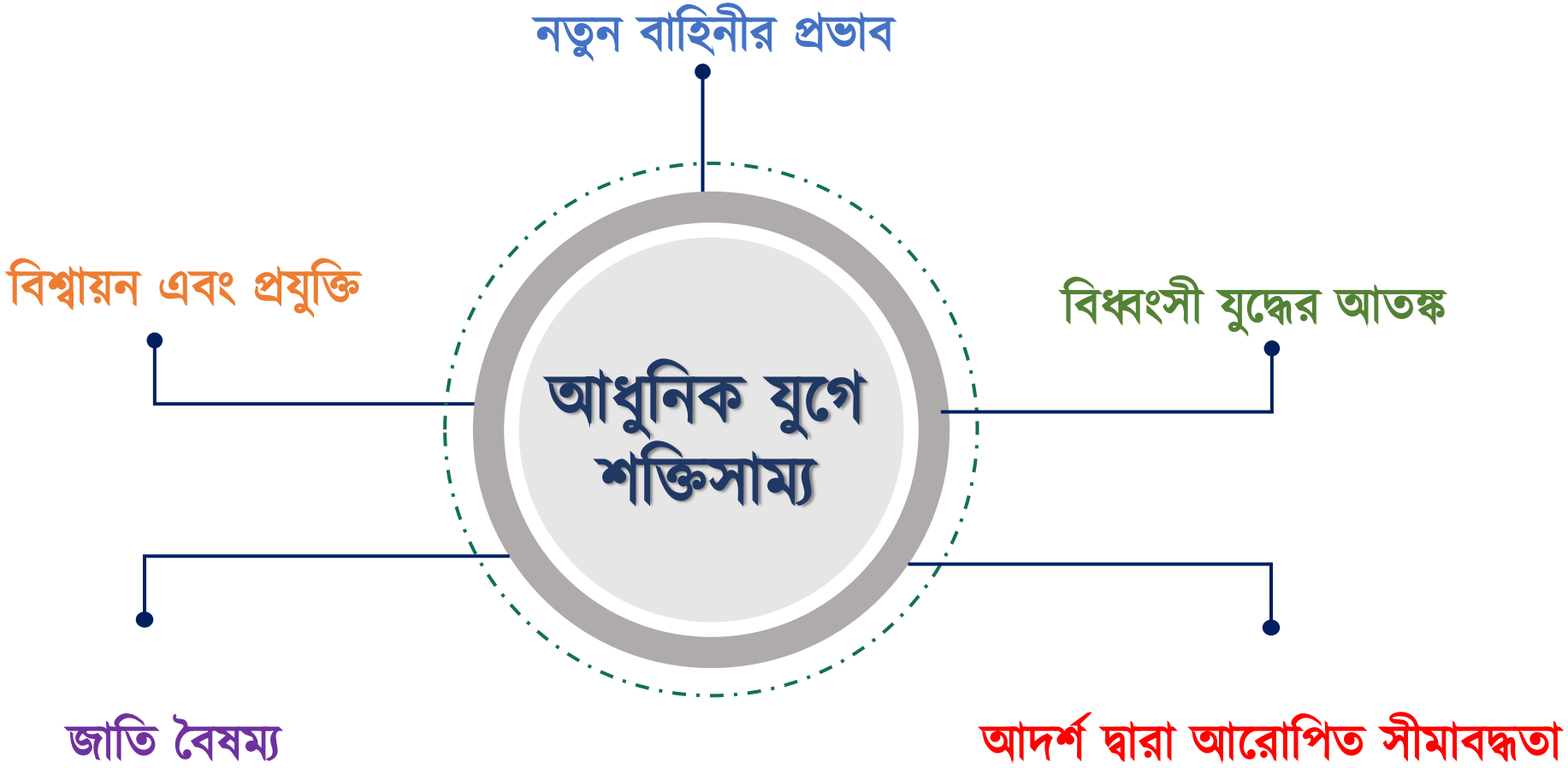

শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

শক্তিগত ভারসাম্য সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। শক্তিগত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রধান কৌশল হলো সবল পক্ষের শক্তি হ্রাস বা দুর্বল পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে ভারসাম্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহের প্রয়োগ করা হয়।

- **মৈত্রীজোট সৃষ্টি:** শক্তি-সাম্য রক্ষার একটি অন্যতম প্রধান কৌশল হলো দুই বা ততোধিক দেশের সংঘবদ্ধ হয়ে মৈত্রীজোট সৃষ্টি করা। যদিও একমাত্র সংকটজনক অবস্থা ছাড়া সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী রাষ্ট্রের মধ্যে জোট গড়ে উঠতে পারে না। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার Grand Alliance গঠিত হয় নাৎসি জার্মানিকে মোকাবিলার জন্য।

- **অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ:** বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি-সাম্য বজায় রাখার একটি বহুল চর্চিত পদ্ধতি হলো নিজেদের অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি করা। প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রসমূহ অন্যরাষ্ট্রদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থায়ী শক্তি-সাম্য অর্জন করতে নিরস্ত্রীকরণের কোনো বিকল্প নেই। পরাশক্তিগুলোর মাঝে শক্তি-সাম্য বজায় রাখতে অনেকবারই নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **ক্ষতিপূরণ:** শক্তিসাম্য রক্ষার একটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো ক্ষতিপূরণ। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীতে পরাধীন উপনিবেশগুলোতে বণ্টনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়।

- **বাফার রাষ্ট্র:** বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির মধ্যবর্তী কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অনেক সময় তাদের মধ্যে শক্তি-সাম্য রক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। এমন রাষ্ট্রকে সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র অথবা Buffer State বলে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত বেলজিয়াম তাদের মধ্যে Buffer State হিসেবে কাজ করে।

- **বহির্শক্তির হস্তক্ষেপ:** অনেক সময় শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য বহির্শক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, শক্তিসাম্য রক্ষাকারী রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটেন এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে হস্তক্ষেপ ঘটেছে। হস্তক্ষেপের ফলে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও রয়েছে।

- **বিভেদ ও শাসন নীতি:** শক্তিসাম্য রক্ষার একটি পুরাতন পদ্ধতি হচ্ছে বিভেদ ও শাসন নীতি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো, বিশেষত ইংল্যান্ড তার উপনিবেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এ নীতি অনুসরণ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্স জার্মানির প্রতি এ নীতি অনুসরণ করেছিল।

নিরাপত্তা

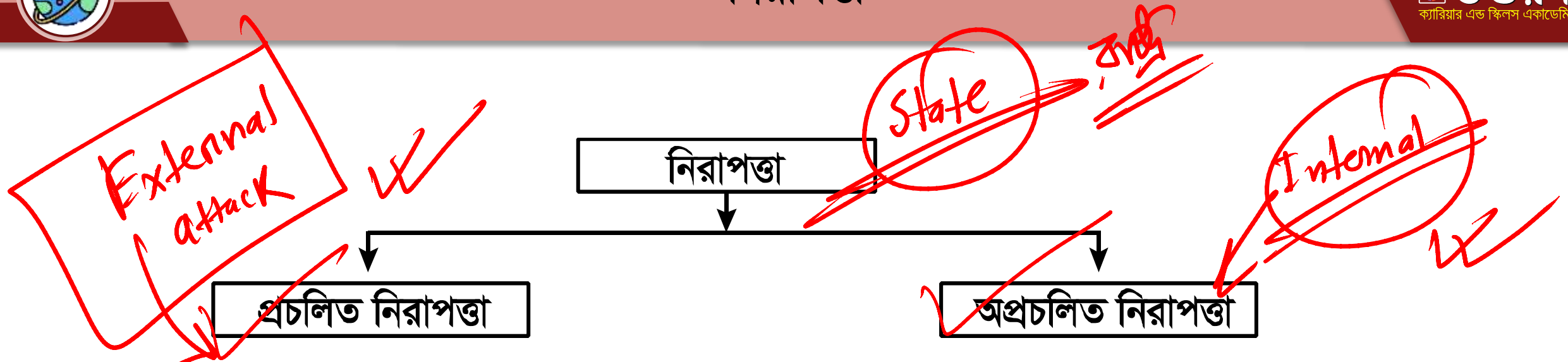

ধ্বংস, সহিংসতা, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণ বা যুদ্ধ থেকে নিরাপদ থাকাকে প্রচলিত নিরাপত্তা বলে।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয়, সম্পদের হ্রাস, দুর্যোগ, পাচার ও অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট।

অপ্রচলিত নিরাপত্তার ৬টি শাখা রয়েছে –

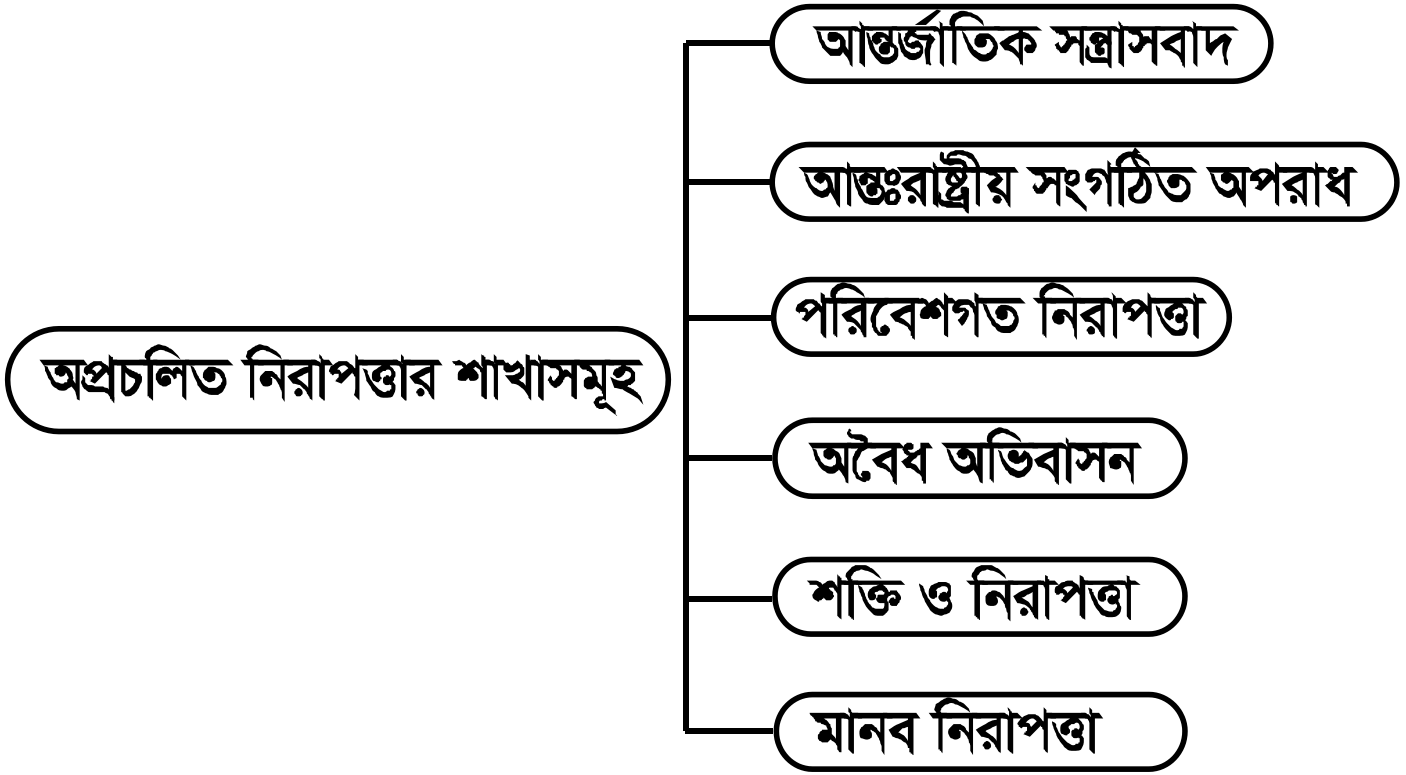

দাতাঁত (DÉTENTE)

দাতাঁত ফরাসি শব্দ। এর অর্থ উত্তেজনা প্রশমন করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আলোচনা শুরু হলে দাতাঁত শব্দটি আলোচনায় আসে। দাতাঁতের মাধ্যমে কিউবা সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে হটলাইন চালু হয়। এর ফলে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

হেনরি কিসিঞ্জারের মতে, "দাতাঁত হলো প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘাত এবং সর্বোপরি পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানোর জন্য চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সমঝোতার গুরুত্ব আরোপ।"

দাতাঁতের বৈশিষ্ট্য

১. উভয়পক্ষ শক্তি জোট অক্ষুণ্ন রেখে সামরিক বাহিনী ও অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করবে।

২. উভয়ের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব বজায় রেখেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে।

৩. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা কমিয়ে এনে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার চেষ্টা চালু রাখবে।

মানবতাবিরোধী অপরাধ

মানবতাবিরোধী অপরাধ বলা হয়, কোনো কার্যত সংস্থা বা রাষ্ট্রের পক্ষে সংঘঠিত সেসব ব্যাপক বা পদ্ধতিগত অপরাধকে যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। এসব অপরাধ যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। যুদ্ধাপরাধের সাথে মানবতাবিরোধী অপরাধের পার্থক্য হলো যুদ্ধাপরাধ যেখানে যুদ্ধকালীন সময়ে সম্পন্ন হয় মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ শান্তি কিংবা যুদ্ধ উভয় সময়ে ঘটতে পারে।

১৯৯৮ সালে রোম স্ট্যাটিউটের ৭ অনুচ্ছেদে মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞানুসারে, একটি ব্যাপক বা পদ্ধতিগত আক্রমনের অংশ হিসেবে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত নিম্নলিখিত অপরাধগুলোর যেকোনোটিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলা হয়। অপরাধগুলো হলো:

- ✓ হত্যা
- ✓ বিনাশ
- ✓ দাসত্ব
- ✓ নির্বাসন বা জনসংখ্যার স্থানান্তর
- ✓ নির্যাতন
- ✓ গুম
- ✓ বর্ণবাদের অপরাধ
- ✓ আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কারাবন্দিকরণ বা শারীরিক স্বাধীনতার গুরুতর বঞ্চনা।
- ✓ ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি, জোরপূর্বক সন্তান ধারণ, জোরপূর্বক নির্বীজিকরণ, তুলনামূলকভাবে গুরুতর অন্য যেকোনো যৌন সহিংসতা।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়া, শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক আঘাত।
- ✓ কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিপীড়ন।

যুদ্ধাপরাধ

যুদ্ধাপরাধ হলো যুদ্ধের আইন বা রীতিনীতির এমন যেকোনো লঙ্ঘন যা অপরাধমূলক কাজের শামিল। এসব অপরাধ বেসামরিক নাগরিক বা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। ১৯৪৬ সালের নুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের সনদ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের অর্ন্তভুক্ত অপরাধ গুলো হলো – বেসামরিক ব্যক্তিদের খুন, নির্বাসন কিংবা নিষ্ঠুর আচরণ, জিম্মিদের হত্যা, সম্পত্তির লুণ্ঠন এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকার বেপরোয়া ধ্বংসসাধন। ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন হলো যুদ্ধাপরাধ। জেনেভো কনভেনশনের অধীন যে কাজগুলো যুদ্ধাপরাধ সেগুলো হলো:

ইচ্ছাকৃত হত্যা।	যুদ্ধবন্দি বা অন্য ব্যক্তিকে নিজেদের বাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করা।
জৈবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ নির্যাতন বা অমানবিক আচরণ।	ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধবন্দি বা অন্য ব্যক্তিকে ন্যায্য বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
ইচ্ছাকৃতভাবে যন্ত্রণা, শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত দেওয়া।	বেআইনি নির্বাসন বা স্থানান্তর বা বেআইনি বন্দি।
বেআইনি এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংস এবং দখল।	জিম্মি করা।

গণহত্যা

কোনো বিশেষ ধর্মমত, রাজনৈতিক মতবাদ বা কৃষ্টিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে নির্মূল বা হীনবল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সুপরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা বলে। ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত এবং ১৯৫১ সালে কার্যকর জাতিসংঘের জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ-২ এ গণহত্যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্মূলের অভিপ্রায়ে সংঘটিত নিম্নের যেকোনো কাজকে গণহত্যা বলে বিবেচিত হবে।

- গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা।
- গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা।
- গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক ধ্বংস সাধনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোষ্ঠীর অবস্থার উপর আঘাত হানা।
- গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্ম রোধ করার জন্য ব্যবস্থা আরোপ করা।
- এক গোষ্ঠীর শিশুদের জোরপূর্বক অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর।

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

➲ "কোন রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস কিংবা স্থগিত করে তবে তাকে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) বলে।" –শে চার

➲ "Disarmament is the process of reduction or elimination of certain or all armaments for the purpose of ending armament race." - Hans. J. Morgenthau

নিষেধাজ্ঞা

- অস্ত্র মজুদ
- অস্ত্রের বিকাশ
- অস্ত্র উৎপাদন
- অস্ত্রের বিস্তার
- অস্ত্রের ব্যবহার

নিরস্ত্রীকরণের প্রকারভেদ

- সাধারণ
- আঞ্চলিক
- সংখ্যাগত
- গুণগত

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

❖ NPT

- ✓ **পূর্ণ রূপ:** Nuclear Non-Proliferation Treaty.
- ✓ **স্বাক্ষর:** ১ জুলাই, ১৯৬৮; কার্যকর ৫ মার্চ, ১৯৭০।
- ✓ **এ চুক্তির মূলভিত্তি তিনটি:** ১. পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করা।
  ২. পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোয় নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা।
  ৩. সব দেশকে পারমাণবিক প্রযুক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- ✓ এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল, যা ১৯৫৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার 'Atoms for Peace' কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু করেন।
- ✓ চুক্তিটি প্রথম ২৫ বছরের জন্য এবং ২৫ বছর পর ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক সম্মেলনে অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা হয়।
- ✓ এ চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল আফ্রিকার ৩৩টি দেশ 'পোলিনদাবা' চুক্তির মাধ্যমে আফ্রিকাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
- ✓ সমালোচকদের মতে, এটি অসম ও বৈষম্যমূলক চুক্তি।
- ✓ উত্তর কোরিয়া ১৯৮৫ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও ২০০৩ সালে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেয়।
- ✓ ভারত, পাকিস্তান, কিউবা এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি।

❖ CTBT

- ✓ **পূর্ণ রূপ-** Comprehensive Test Ban Treaty.
- ✓ **চুক্তি স্বাক্ষর:** ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
- ✓ জাতিসংঘে CTBT উত্থাপন করে অস্ট্রেলিয়া।
- ✓ চুক্তিটির ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের পারমাণবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪টি দেশের প্রত্যেকের স্বাক্ষর ও অনুমোদন না দিলে এটা কার্যকর হবে না।
- ✓ পারমাণবিক শক্তিধর ৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য চুক্তিটি অনুমোদন করছে। চুক্তিটির মাধ্যমে পারমাণবিক পরীক্ষার কার্যক্রম রোধ করা হলেও পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসের কোনো বিধান রাখা হয়নি।
- ✓ বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর ১২৯তম দেশ হিসেবে CTBT স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের ৮ মার্চ ২৮তম দেশ হিসেবে CTBT অনুমোদন করে।
- ✓ স্বাক্ষর না করা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া, কিউবা, ভুটান ইত্যাদি।

❖ Chemical Weapons Convention (CWC)

- ✓ **চুক্তি স্বাক্ষর:** ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩।
- ✓ **চুক্তি কার্যকর:** ২৯ এপ্রিল, ১৯৯৭।
- ✓ চুক্তিটিতে মোট স্বাক্ষরকারী দেশ ১৬৫টি; অনুসমর্থনকারী দেশ – ১৯৩টি (সর্বশেষ ফিলিস্তিন)। মিসর, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ সুদান চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি আর ইসরাইল চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও অনুমোদন করেনি।
- ✓ **চুক্তির উদ্দেশ্য:** এ চুক্তির মাধ্যমে সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, উন্নয়ন, ব্যবহার, মজুত, বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়।

❖ TPNW (Treaty on the Prohibition of nuclear weapons)

- ✓ **চুক্তি স্বাক্ষর:** ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (নিউইয়র্ক)।
- ✓ কার্যকর হয়: ২২ জানুয়ারি, ২০২১।
- ✓ স্বাক্ষরকারী দেশ: ৮৪টি।
- ✓ উদ্দেশ্য: পরমাণু যুদ্ধ এড়ানো।
- ✓ **শর্তসমূহ:**
  - পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুতকরণ, স্থানান্তর, ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।
  - প্রতিটি রাষ্ট্র চুক্তিটি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সহযোগিতা করবে।
  - পারমাণবিক অস্ত্রের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সকল প্রকার বাণিজ্য বন্ধ থাকবে।
  - পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
  - জাতীয়ভাবে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য নীতিগতভাবে চুক্তিকে সমর্থন দিতে হবে।
  - জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতিসংঘের সকল পরমাণু নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকবে।
  - যদি কোনো রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে পারমাণবিক কার্যক্রম নির্মূল করে তাহলে এই বিষয়ে দক্ষ আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা তা পরীক্ষা করা হবে।
- ✓ দুর্বলতা: জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে চুক্তির পক্ষে পড়েছে ১২২টি ভোট। নেদারল্যান্ডস বিপক্ষে ও সিঙ্গাপুর ভোটদানে বিরত ছিল। দুঃখের বিষয় হলো পরমাণু অস্ত্রের শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া ও ইসরাইল এই চুক্তি সংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ

Name of the Treaty	Years
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)	1972
SALT-1 (IBM $\leq$ 2250) (BM- Ballastic Missile)	1979
START-1 (Strategic Arms Reduction Treaty) Long-range missile $\leq$ 600	1991
START-2 (nuclear warhead $\leq$ 3500)	1993
START-3	1997
START-4	2010

নিরস্ত্রীকরণের সফলতার অন্তরায়

"Nuclear disarmament and non-proliferation are not utopean ideals. They are critical to global peace and security" -Ban Ki-Moon. বিশ্বরাজনীতিতে মারণাস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর পারস্পারিক প্রতিযোগিতাকে প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার অস্ত্র উৎপাদন এবং পরিমাণ হ্রাস করার যে বৈশ্বিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায় তাকেই নিরস্ত্রীকরণ বলে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য নিরস্ত্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি অনেক আলোচিত হলেও বাস্তবিকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ ও সীমিতকরণের যেসব আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে তা ফলপ্রসূ নয়।

নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়নের পথে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- **জাতীয় নিরাপত্তা:** প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থকে চিন্তা করে অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত করে থাকে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় শান্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার কোনো কার্যকরী প্রতিশ্রুতি না থাকায় কোনো রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণে আগ্রহী হবে না।
- **আধিপত্য বজায় রাখা:** পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সব সময়ই চায় বিশ্ব রাজনীতিতে তার আধিপত্য বজায় থাকুক। নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে পরাশক্তিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা সবচেয়ে বড় বাঁধা। তাই ১৯৭১ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পরমাণু অস্ত্র ১০০ তে কমিয়ে আনার কথা বললেও যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার অনিচ্ছায় তা বাস্তবায়িত হয়নি।

নিরস্ত্রীকরণের সফলতার অন্তরায়

- **অস্ত্র বাণিজ্য:** বিখ্যাত বিপ্লবী চে গুয়েভারা বলেন, "সর্বাত্মক যুদ্ধ জারি রাখা আমেরিকার স্বাস্থ্য বিমা।" এখানে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র নয় অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অস্ত্র বাণিজ্যের কারণেই নিরস্ত্রীকরণ সফলতা লাভ করছে না।
- **আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার:** বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় আঞ্চলিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে যা নিরস্ত্রীকরণের পরিবর্তে দেশগুলোকে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে। এই কারণেই মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, ইসরাইল, এশিয়ার ভারত, চীন, পাকিস্তান তাদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলছে।
- **ঐকমত্যের অভাব:** নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি সফল করতে হলে সব রাষ্ট্রগুলোর ঐকমত্যের প্রয়োজন কিন্তু পারস্পরিক আস্থা না থাকার কারণে তারা তাদের অস্ত্রের মজুদ বাড়িয়ে চলছে। উত্তর কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আস্থা না থাকার কারণে তারা পরস্পর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলছে।
- **কৌশলগত ভূ-রাজনীতি:** মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশগুলো ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কৌশলগত স্থানে অবস্থান করছে যা তাদের নিরস্ত্রীকরণের পথে বড় বাঁধা। তাই দেখা যায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ পরমাণু সক্ষমতা অর্জনের পরেও ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকার কারণে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের সফলতার অন্তরায়

- **সংঘাতময় আন্তর্জাতিক রাজনীতি:** বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি ব্যবস্থা সংঘাতময়। এ সংঘাতময় বিশ্ব ব্যবস্থা পরাশক্তি দেশ ও জাতিকে প্রভাবিত করে। ফলে নিরস্ত্রীকরণের বদলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণে।

- **চুক্তির কার্যকারিতা:** নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সকলের সদিচ্ছা থাকলেও চুক্তি কার্যকরের বিষয়টি একটি বড় সমস্যা। কারণ চুক্তিতে সম্মত হবার পরে একটি দেশ গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে কি না তা জানা যায় না। এভাবেই গোপনে ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া ও ইরান সেই পথেই এগোচ্ছে।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ভয়াবহ অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানবসভ্যতাকে যে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে তা ঠেকানোর প্রয়োজনীয়তা পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেছে এবং নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যদিও বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এই পরাশক্তির রাষ্ট্রগুলোকেই সামনে থাকতে হবে এবং যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা

দীর্ঘ ছয় বছর (১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল) পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। বিজয়ী মিত্রশক্তি পরবর্তীকালে যাতে যুদ্ধ ও সংঘাত প্রতিরোধ করা যায় এই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। তখন বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোতে এখনও প্রতিফলিত হয়ে চলছে।
উদাহরণস্বরূপ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষেদের ৫টি স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে কোনো প্রস্তাব তোলা হলে পাঁচটি দেশের যেকোনো একটি তার ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রস্তাবটি আটকে দিতে পারে। অন্যসব দেশ প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও কোনো কাজ হয় না।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার যুক্তি মূলত স্থায়ী সদস্যদের স্বার্থের উপর নির্ভর করে। তারা মনে করে যে শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই সম্ভব যদি বৃহৎ শক্তিগুলো একসাথে কাজ করে । সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতা রাখার যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন সেগুলো হলো:

- ভেটো ক্ষমতা ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন।
- যদি স্থায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় তবে জাতিসংঘ ভেঙে যেতে পারে।
- স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে এটি নিরাপত্তা পরিষদকে বাধা দেয়।

পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যদেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স বেসামরিক মানুষকে রক্ষার চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ বা ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশের মধ্যে USA সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয়। এটাও একটি কারণ হতে পারে যে, একারণেই তারা সবসময় ভেটো পাওয়ার পেতে চায়। আবার, বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক বা সামরিক দিক দিয়েও এই পাঁচটি দেশই সবচেয়ে শক্তিশালী। একারণেই তারা সবসময় ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা চায়। মূলত ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এসব দেশ তাদের আধিপত্য সবসময় বিস্তার রাখতে চায় তাই তারা ভেটো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চায় না।

বর্তমানে আলোচিত বিভিন্ন অস্ত্র

➲ **এস-৫০০ ক্ষেপণাস্ত্র:** এস-৫০০ একটি বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। অত্যাধুনিক এই এস-৫০০ ব্যবস্থার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান আলমাজ-অ্যান্ট। বিশ্বে এস-৫০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমান কোনো অস্ত্র নেই। দীর্ঘপাল্লার এই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান ভূপাতিত করার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট বিধ্বংসী কাজেও ব্যবহার করা হবে। এস-৫০০ প্রযুক্তির এই মিসাইলের নাম দেওয়া হয়েছে প্রমিথিউস (Prometheus)। শুধু কক্ষপথে থাকা কোনও উপগ্রহই নয়, অত্যাধুনিক হাইপারসনিক মিসাইল ধ্বংস করতেও সক্ষম এই এস ৫০০ প্রযুক্তির প্রমিথিউস। ২০১৪ সালে এর কাজ শুরু করেছিল রাশিয়া। ২০২০ সালে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ২০২৫ সালে সম্পূর্ণভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পাবে মস্কো।

'মহাকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম প্রজন্মের অস্ত্র হলো এস-৫০০ মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র। ভবিষ্যতে মহাকাশ অস্ত্র এবং পৃথিবীর কাছের কক্ষপথে থাকা উপগ্রহকেও ধ্বংস করতে পারবে এটি।' সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানিয়েছেন রুশ কর্নেল-জেনারেল সার্জেই সুরোভিকিন।

এস-৫০০ এর বৈশিষ্ট্য

- ✓ এটি বিশ্বের সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র।
- ✓ এ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার পাল্লা হলো ৬০০ কিলোমিটার
- ✓ এটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুকে হাইপারসনিক গতিতে বাধা দিতে পারে।
- ✓ সেকেন্ডে ৭ কিলোমিটার গতিবেগে আঘাত হানতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র।
- ✓ শক্তিশালী রাডারের কারণে আকাশের প্রতিটি বস্তুই চিহ্নিত করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র।
- ✓ একসঙ্গে ১০টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে নিশানা করতে এবং তারমধ্যে ৭টিকে এক আঘাতেই ধ্বংস করতে সক্ষম এই এস-৫০০ মিসাইল।

Slide

বর্তমানে আলোচিত বিভিন্ন অস্ত্র

➲ **S-400 ক্ষেপণাস্ত্র:** S-400 একটি বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। অস্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান SIPRI S-400 কে বিশ্বের এডভান্স বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৯ সালে তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি কিনেছে, ফলে বিশ্বব্যাপী নতুন করে আলোচনায় এসেছে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি।

➲ **ICBM:** ICBM এর পূর্ণরূপ হলো Intercontinental Balastic Missile বা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র। এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র এক মহাদেশ থেকে উড়ে গিয়ে অন্য মহাদেশে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করতে সক্ষম। পঞ্চশক্তির বাইরে উত্তর কোরিয়া ২০০৬ সালে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী হয়। এটি মূলত পরমাণু অস্ত্র বহনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন রেঞ্জ ৫৫০০ কিলোমিটার বা ৩৪০০ মাইল।

➲ **এবিএম (ABM):** ABM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Anti Ballastic Missile. এটি পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণু অস্ত্রবাহী যেকোনো ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করতে সক্ষম। যেমন: HQ 29, THAAD প্রভৃতি।

বর্তমানে আলোচিত বিভিন্ন অস্ত্র

➲ **THAAD:** THAAD বা Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) হচ্ছে এক ধরনের মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনকারী সংস্থা লকহিড মার্টিন THAAD মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে। শত্রু দেশ থেকে যদি কোনো মিসাইল নিক্ষেপিত হয়, THAAD প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তা মহাশূন্যেই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এটি ব্যবহার করে এবং ইতোমধ্যে আরব আমিরাত, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে তা মোতায়েন করা হয়েছে।

➲ **ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র (WMD):** ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র (Weapons of Mass Destruction- WMD) হলো – পারমাণবিক, রেডিওলজিক্যাল, রাসায়নিক, জৈবিক অথবা অন্য কোনো অস্ত্র যেগুলো ব্যাপক সংখ্যক মানুষ হত্যা করাসহ মনুষ্য নির্মিত কাঠামো, প্রাকৃতিক কাঠামো এবং জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এই বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়। ২০০৩ সালে ইরাকে এই অস্ত্র আছে এমন অভিযোগ করে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে আক্রমণ চালায়।

➲ **প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র:** প্যাট্রিয়ট (MIM-104) একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যা যেকোনো আবহাওয়াতেই ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলা করতে পারে। এটি ব্যালিস্টিক মিসাইল, ক্রুজ মিসাইল ও অ্যাডভান্স এয়ারক্রাফট হামলা মোকাবিলায় বেশ পারদর্শী। এ ব্যবস্থায় রাডারে কোনো বহিরাগত হামলা শনাক্ত হলে এটি ৯ সেকেন্ডের মাঝে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং আধা মিনিট থেকে তিন মিনিটের মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এটি মাথায় ৯০ কেজি ওজনের বিস্ফোরক বহন করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের সময় এটি ব্যবহার করে। কুয়েতে স্থাপনকৃত এই ক্ষেপণাস্ত্রটি সফলভাবে বিপুলসংখ্যক গাইডেড মিসাইল ধ্বংস করেছিল।

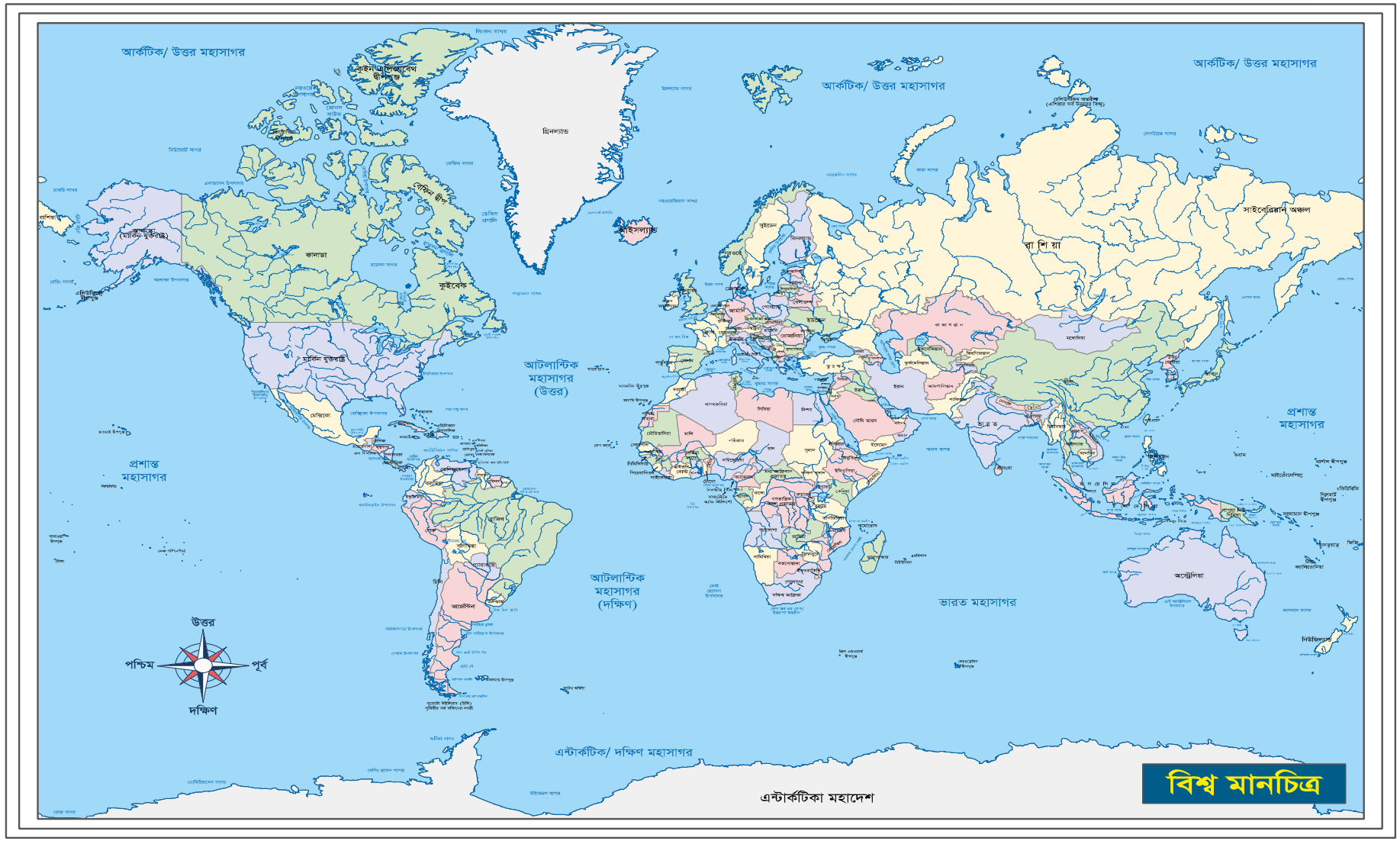

ভূ-রাজনীতি (GEOPOLITICS)

Geopolitics: Geo-politics শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ Geopolitik হতে, যার ইংরেজি হচ্ছে দুটি শব্দের রূপ: Geo অর্থ ভূ (earth) এবং Politikos অর্থ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত (Pertaining to the state)। সুতরাং ভূ-রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সমন্বিত রাজনীতি।

জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল কান্ট সর্বপ্রথম ভূ-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তবে ফ্রেডরিক রেজেলকে ভূ-রাজনীতির জনক এবং রুডলফ কিয়েলেনকে আধুনিক ভূ-রাজনীতির জনক বলা হয়।

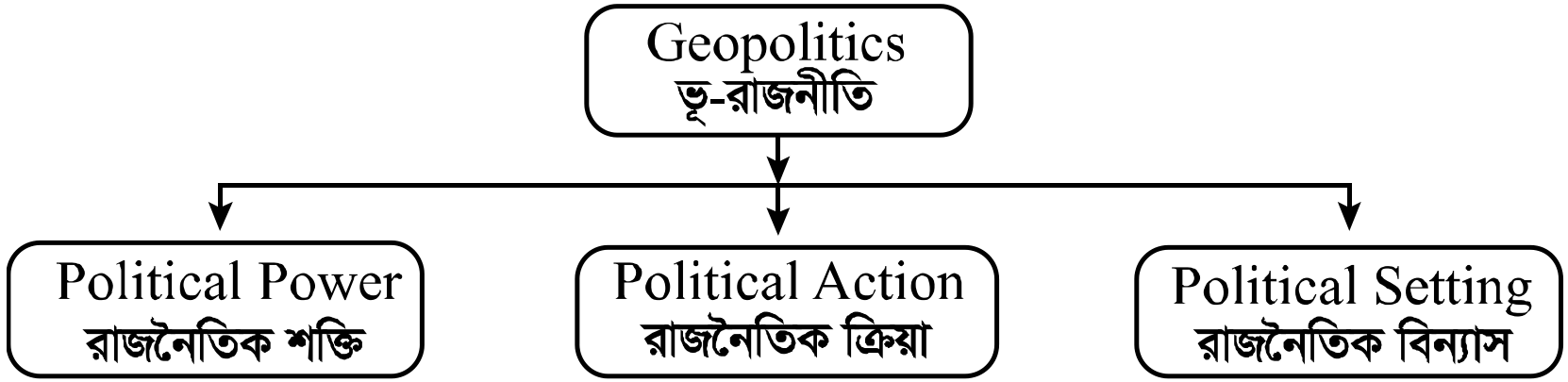

ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব

জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল কান্ট সর্বপ্রথম রাজনীতি এবং ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ফ্রেডরিক রেজেল, রুডলফ কিয়েলেন, হ্যালফোর্ড জে ম্যাকাইন্ডার, কার্ল হাউজহফার, নিকোলাস স্পাইকম্যান, আলফ্রেড টি মাহান সহ অনেকেই ভূ-রাজনীতিকে নানাভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

তিনটি প্রধান ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব:

- জৈবিকসত্ত্বা তত্ত্ব – Individual Organism Theory
- হৃদভূমি তত্ত্ব – Heartland Theory
- রিমল্যান্ড তত্ত্ব – Rimland Theory

হৃদভূমি তত্ত্ব বা (Heartland Theory) : হ্যালফোর্ড জে ম্যাকাইন্ডার ১৯০৪ সালের The Geographical Pivot of History শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে হৃদভূমি তত্ত্ব (Heartland Theory) ব্যাখ্যা করেন। ম্যাকাইন্ডার পূর্ব ইউরোপকে পৃথিবীর হৃদভূমি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, যে পূর্ব ইউরোপ শাসন করে সে হৃদভূমি শাসন করে, যে হৃদভূমি শাসন করে সে বিশ্ব দ্বীপ শাসন করে, যে বিশ্ব দ্বীপ শাসন করে সেই বিশ্ব শাসন করে।

রিমল্যান্ড তত্ত্ব (Rimland Theory) : আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট নিকোলাস স্পাইকম্যান ১৯৪২ সালে রিমল্যান্ড তত্ত্ব প্রদান করেন। রিমল্যান্ড হলো- ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং চীনের উপকূলীয় অঞ্চল। এই তত্ত্বানুসারে, যারা রিমল্যান্ড অর্থাৎ Inner Marginal Crescent নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই পৃথিবীর ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

ভূ-রাজনীতির উপাদান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে সকল রাষ্ট্রই সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, ভৌগোলিক সীমারেখা, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সম্মানের ভিন্নতা হয়ে থাকে। একটি রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো:

- **আঞ্চলিক অবস্থান:** আঞ্চলিক অবস্থান আধুনিককালে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূ-বেষ্টিত দেশ ও সমুদ্র বেষ্টিত দেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সমুদ্র বেষ্টিত দেশ ভূ-বেষ্টিত দেশের তুলনায় নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে। কোনো রাষ্ট্রের কৌশলগত স্থানে অবস্থানের কারণে বিশ্ব বাণিজ্য ও সামরিক তৎপরতার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

- **প্রতিবেশী রাষ্ট্র:** যেকোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার সম্পর্ক কী সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবেশী যদি বড় ও ব্যাপক ক্ষমতাধর হয় তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে তাকে সমীহ করে চলতে হয়, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অনেক ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রও বৈদেশিক কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে নিজেকে প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র হতে অধিকতর ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

- **ভৌগোলিক আয়তন:** যেকোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক আয়তন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়তনের দিক থেকে বড় রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সম্পদও বেশি হয়, যা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ভারতের কথা বলতে পারি।

- **রাষ্ট্রের পরিধি:** যে রাষ্ট্রের পরিধি যত বড় সে রাষ্ট্রের ভূ-রাজনীতি নির্ধারণও জটিল। কারণ অনেকগুলো রাষ্ট্রের সাথে তার সীমান্ত থাকে যা তাকে সবসময়ই মাথায় রাখতে হয়। তবে, অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরিধি বড় হলেও সবসময় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র যেমন বড়, তেমন বিস্তৃতও, কিন্তু তার থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর দূরত্ব এতই বেশি যে, কোনো রাষ্ট্র ইচ্ছে করলেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি যেতে পারে না।

- **আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি:** রাষ্ট্রের ভূ-রাজনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে দেশের আবহাওয়া ও অভ্যন্তরীণ কাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে পাহাড় আর অরণ্য বেশি, সে দেশ অন্য দেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আবার যে দেশের অভ্যন্তরে নদ-নদী বেশি সেটাও সে দেশের ভূ-রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে দেশের মানুষের আচার-আচরণ, শারীরিক শক্তি ও কর্মস্পৃহার পার্থক্য ঘটে, যা একটা দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও ভূ-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **রাষ্ট্রীয় ঐক্য:** রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য একটি বিশাল সম্পদ। যেমন কোনো রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী যদি সমজাতীয়ভুক্ত হয়, তাহলে সে রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ যতটা সহজ হয়, অন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। বরং অনেক সময় তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটাতেই তাদের অনেক শক্তি ক্ষয় হয়।

- **প্রাকৃতিক সম্পদ:** একটা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জনে সাহায্য করে। একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে সে দেশের বাণিজ্য, কূটনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। এটি জাতীয় শক্তি অর্জন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করে।

সুতরাং উপরিউক্ত বহুবিধ বিষয় দ্বারা একটা রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অবস্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ও কোনো রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ হয়ে যায়।

ভূ-অর্থনীতি

➲ "The continuation of the ancient rivalry of the nations by new industrial means."- **Dr. Edward**

➲ ভূ-রাজনীতিতে একটি **শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষুদ্র বা দুর্বল রাষ্ট্রকে** ভৌগোলিকভাবে **দখল** করে থাকে।

➲ ভূ-অর্থনীতির বিষয় **ভৌগোলিক নয়** বরং **পণ্যের বাজার**।

➲ ভৌগোলিক দখলদারির পরিবর্তে **পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ** ও অধিকার প্রাধান্য পায় **ভূ-অর্থনীতিতে**।

যেমন-

- ➲ SAPTA
- ➲ SAFTA
- ➲ ASEAN

NAFTA

সন্ত্রাসবাদ (TERRORISM)

ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবী জনতা রাজতন্ত্রীদেরকে নির্বিচারে শিরশ্ছেদ করে ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৯৩-৯৪ পর্যন্ত তাদের এই নৃশংসতাকে ডাকা হতো La Terreur নামে। সেই থেকে Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ শব্দটির উদ্ভব।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে ঐকমত্য নেই। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে সন্ত্রাসবাদ হলো ...premeditated, politically motivated violence against noncombatant targets by subnational groups.

আমেরিকান রাজনৈতিক দার্শনিক Michael Walzer এর মতে, "Terrorism is the deliberate killing of innocent people, at random, to spread fear through a whole population and force the hand of its political leaders".

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক David Rapport এর মতে এই পর্যন্ত চারটি মূল সন্ত্রাসবাদী ঢেউ উঠেছে বিশ্বব্যবস্থায়। এরা হলো,

১। নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদ, ২। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সন্ত্রাসবাদ,
৩। নব্য বামপন্থী সন্ত্রাসবাদ ও ৪। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে। যেমন-

- **পূর্বপরিকল্পিত:** সন্ত্রাসবাদী নাশকতার পেছনে দীর্ঘদিনের সূক্ষ্ম ও সংগঠিত পরিকল্পনা থাকে। যেমন- আল কায়েদার টুইন টাওয়ার হামলার পরিকল্পনা অন্তত চার বছরের পুরোনো ছিল।

- **রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পরিচালিত:** সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থ জড়িত থাকে। ফরাসি বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্র হটিয়ে একটি রিপাবলিক স্থাপন করা। তেমনই, ইসলামি স্টেটের সন্ত্রাসবাদীরা শরীয়াহ ভিত্তিক একটি স্বাধীন ভূখণ্ড নির্মাণ করতে চেয়েছে।

- **বেসামরিক ভুক্তভোগী:** সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের শিকার হন মূলত বেসামরিক জনগণ। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর সামরিক সক্ষমতা কম থাকায় তারা সরাসরি সামরিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে না।

- **মনস্তাত্ত্বিক আঘাত:** সন্ত্রাসবাদীরা জনমনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা যতোটা না ক্ষতি করে তারচেয়ে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা ও ভীতি উৎপাদন করে। সন্ত্রাসবাদীদের হুমকি থেকে নিরাপদ বোধ করার জন্য যত খরচ হয় তার তুলনায় সন্ত্রাসবাদীদের সরাসরি আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। মনস্তাত্ত্বিক David Gilbert বলেন, Terrorism is like theater, and terrorists rely on the dramatic effect of their actions to magnify the action.

- **প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশী:** সন্ত্রাসবাদী নাশকতার মূল লক্ষ্য থাকে কর্তৃপক্ষকে উসকে দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া আদায় করে নেওয়া। সন্ত্রাস দমনের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আক্রমণের শিকার হয়ে বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা সন্ত্রাসবাদীদের সরাসরি আক্রমণে নিহতের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী। এই ধরনের পরিসংখ্যান সন্ত্রাসবাদীদের এজেন্ডার পক্ষে জনসমর্থন আদায় করে।

সাইবার সন্ত্রাসবাদ

বিশ্বব্যবস্থায় শাসক ও শোষিত, সুবিধাভোগী ও উপেক্ষিতের দ্বৈততা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ বজায় থাকবে। সময়ের বিবর্তনে সন্ত্রাসবাদও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। নব্য সন্ত্রাসবাদের মাধ্যম হয়ে উঠছে ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগৎ। বাস্তব পৃথিবী পরিচালনায় নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরতা যত বাড়ছে ততোই এই ধরনের Cyber Terrorism এর ঝুঁকি বেড়ে চলেছে। বিশ্বনেতা নির্বাচন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক জালিয়াতি পর্যন্ত সাইবার সন্ত্রাসীরা পৌঁছে গেছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোগুলো এই ধরনের নব্য সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লংঘন করে জনমানুষের জীবনধারার একান্ত অঙ্গনে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেছে। আগামী বিশ্ব প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে যতোই শাণিত হবে এই ধরনের নিরাপত্তাহীনতার ভাবনা ও বিরোধী পদক্ষেপও জীবনের সর্বস্তরে ততোই অনুপ্রবেশ করবে।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদ

ইসলামি শাসনতন্ত্রের কথা বলে জনমত আদায় ও বিপ্লব সৃষ্টির কার্যকর কোনও পথ না থাকলেই সেসব অঞ্চল থেকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের শুরু হয়। আল কায়েদা এমন একটি সংগঠন। পশ্চিমা শক্তি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলোতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা চালায়। কিছু ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রীতি প্রকৃতির তোয়াক্কা না করে সন্ত্রাসী সংগঠনের মতো আচরণ করতে পারে। Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) এমন একটি সন্ত্রাসী স্টেটের উদাহরণ ছিল। একই রকম আরও কিছু উদাহরণ হতে পারে সোমালিয়ার আল শাবাব, নাইজেরিয়ার বোকো হারাম, উত্তর আফ্রিকার ইসলামিক মাগরেব। এই সংগঠনগুলো নিজ দেশে রাজনৈতিক সংগঠনের মতো আচরণ করতে পারে।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। আল কায়েদার পরিকল্পিত এই আক্রমণে ২৯৭৪ জন বেসামরিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে ইসলামি উম্মাহর মুক্তি। অথচ, অদ্ভূত ব্যাপার হলো ইসলামি সন্ত্রাসবাদের শিকার মূলত মুসলিমরাই। বিশ্বজুড়ে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের ভুক্তভোগী হচ্ছে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ যেখানে এসব সংগঠনের বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতার অভাব আছে। অন্যদিকে, এই সন্ত্রাসবাদের কারণে এইসব অঞ্চল ও রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মূলত, এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। দারিদ্র্য ও দুর্বল অবকাঠামোর মিলিত ফলাফল হলো কুসংস্কার ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা। এই অস্থিতিশীল পরিবেশেই যুবসমাজ ক্ষুব্ধ, হতাশ ও অসহায় হয়ে পড়ছে। তাদের এই অসহায়ত্ব ও হতাশাকে আক্রোশে পরিণত করার লক্ষ্যে শান্তির ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা ব্যবহার করছে কিছু বিপথগামী মানুষ। আদর্শগত অথবা শুধু জীবিকার কারণে তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা যুবসমাজের মগজ ধোলাই করছে। এভাবেই চলছে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের দুষ্টচক্র।

ইসলামোফোবিয়া

সাম্প্রতিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক শক্তি সম্পর্ক ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি উভয় অঙ্গনে ইসলামভীতি ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সংস্কৃতি হিসেবে ইসলাম ও মানুষ হিসেবে মুসলমানদের প্রতি অযৌক্তিক ঘৃণারই সাধারণ পরিচিতি ইসলামোফোবিয়া।

(Clash of the civilization) 9/11

ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তি

অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী, ১৯২৩ সালে ভাষাতত্ত্বের উপর প্রকাশিত একটি রিপোর্টে প্রথম 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে আঠারো শতকের শুরুর দিকে ইউরোপে মুসলিম কট্টরপন্থীদের কর্মকাণ্ড বুঝাতে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। ২০০৪ সালে কফি আনান 'ইসলামোফোবিয়ার মুখোমুখি' শিরোনামে এক কনফারেন্সে ধর্মান্ধতা বুঝতে 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন।

১৯৯৭ সালে Runnymade রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটির প্রচলন শুরু হয় এবং ৯/১১ ট্রাজেডির পর রাজনৈতিকভাবে এর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। প্রফেসর জাফর ইকবাল তার 'Islamopobia' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকেই ইসলাম/মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ দেখা যায় পরবর্তীতে বিভিন্ন যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। সংঘাতের ও বিদ্বেষের মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তি বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়া

৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা এবং ইসলামের নামে চালিত অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের উপর ঘৃণা মহামারির মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কাউন্সিলের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে "ইসলামোফোবিয়া একটি কাল্পনিক ধারণা বা বিশ্বাস যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, নিপীড়ন, বিদ্বেষ, অনর্থক আক্রমণ, তাদের ধর্মীয় ও মানব অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে অনুমোদন করে।"

ইসলামোফোবিক বৈষম্যের ফলে মুসলিমদের উপর অযাচিত রাষ্টীয় ও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে যার ফল স্বরূপ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন, এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবন যাপন ও কঠিন করে তুলেছে। বর্ণ বা লিঙ্গ বৈষম্যের ন্যায় এই বৈষম্য প্রতিরোধ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেই। UNHCR এর বিশেষ প্রতিনিধি আহমদ শহীদ তার এক রিপোর্টে বলেছেন- মুসলিম মহিলারা তিন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন একই সাথে। প্রথমত মুসলিম, দ্বিতীয়ত সংখ্যালঘু এবং তৃতীয়ত নারী। প্রথাগত এই ঘৃণা মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার মাধ্যমে আরো ছড়িয়ে পড়ছে। ৯/১১ বা অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যা ইসলামের নামে চলানো হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া ছোট ছোট মুসলিম কমিউনিটির উপরেও পতিত হয়। যদিও তারা এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন রাষ্ট্রে, ভিন্ন সমাজে এই ধরনের বিদ্বেষ ও বৈষম্যকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক সংস্থা।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- QUAD বলতে কী বোঝায়? QUAD গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট ব্যবস্থায় ভেটো ক্ষমতার বিধান রাখার অন্তর্নিহিত যুক্তি কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- Soft power বলতে কী বোঝায়? রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নে এটির প্রয়োগ কতটুকু বাস্তবসম্মত? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- হাইব্রিড যুদ্ধ কী? হাইব্রিড যুদ্ধের লক্ষ্য কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- সাইবার সন্ত্রাস বলতে কী বোঝায়? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী কী? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'মানবিক হস্তক্ষেপ' নীতিটি কী? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতখানি প্রাসঙ্গিক? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- ইসলামোফোবিয়া ধারণাটি সম্পর্কে লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের গতিপ্রকৃতি উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- মানব নিরাপত্তার প্রধান উপাদানসমূহ কী কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক হুমকির মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বলতে কী বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি বলতে কী বুঝায়? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- সন্ত্রাসবিরোধী ইসলামি সামরিক জোট সম্পর্কে লিখুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- অপ্রচলিত নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

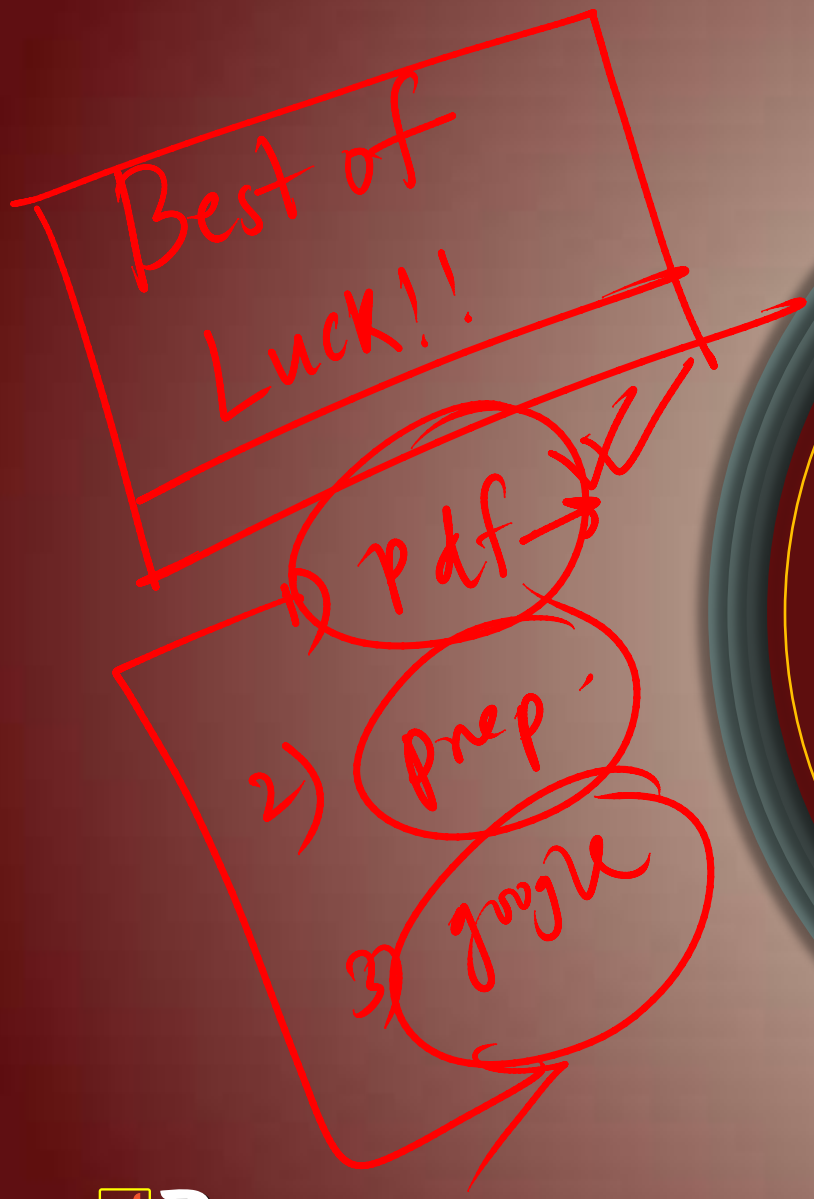

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়